প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
অমলকৃষ্ণ কুমার
উমাশংকর প্রেস
১২ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গৌতম রায়

সূচী

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

তুলনাহীনা

কত না অশ্রু জল

মুসাফির

ভবঘুরে ও অন্যান্য

পঞ্চতন্ত্র (১ম ও ২য়)

হিটলার

অবিশ্বাস্য

জলে ডাঙায়

ধূপছায়া

শবনম্

দ্বন্দ্ব মধুর

শহর ইয়ার

প্রেম

হাস্যমধুর

চতুরঙ্গ

ব-পুরাণ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্র... বক্তৃতা প্রচুরতর প্রবন্ধ এবং অল্প-বিস্তর বেতার কার্যকলাপের ব্যবস্থা ...শের গুণী-জ্ঞানীরা করে থাকেন। সেই অবসরে কেউ কেউ আমাকে ... স্মরণ করেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এঁরা ...মার কল্যাণ কামনা করেন ; সরল জনের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে এই করে হয়তো দেশে আমার নামটা কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আস...লে যাঁরা আমাকে স্মরণ করেন তাঁরা আমার প্রাণের বৈরী। এঁরা আমাকে ...র্বজনসমক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে চান, দেখো, এ লোকটা কতবড় গণ্ডমূর্খ ; কবিগুরুর সংস্পর্শে এসেও এর কিছু হল না। সাধে কি আর তুলসীদাস রাম-চরিতমানসে বলেছেন,

"মূরখ হৃদয় ন চেৎ, যদপি মিলয়ে
গুরু বিরিঞ্চি শত"

"শত ব্রহ্মা গুরুপদ নিলেও মূর্খের
হৃদয়ে চেতনা হয় না"

আমি মূর্খ হতে পারি কিন্তু এতখানি মূর্খ নই যে তাঁদের দুষ্টবুদ্ধিজাত নষ্টামির চিন্তা ধরতে পারবো না।

তাই ঐ সময়টায় আমি গা ঢাকা দিয়ে থাকি। নিতান্ত কারো সঙ্গে দেখা হলে বলি, এন্‌জাইনা থ্রম্‌বোসিস হয়েছে। এন্‌জাইনা পিক্‌টরিস্‌ কিংবা করোনারি থ্রম্‌বোসিস—এর যে কোনো একটার নাম শুনলেই সুস্থ মানুষের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম করে—আমার ঐ দ্বন্দ্ব সমাস শুনে আমাকে তখন আর কেউ বড় একটা ঘাঁটায় না।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলবার সাধ যে আমার হয় না, তাও নয়। অবশ্য তাঁর কাব্য, নাট্য কিম্বা জীবনদর্শন সম্বন্ধে নয়। অতখানি কাণ্ড-জ্ঞান বা কমনসেন্‌স্‌ আমার আছে। আমার বলতে ইচ্ছে করে সেই জিনিস,

ইংরিজিতে যাকে বলে লাইটা
করতে ভালোবাসতেন কি না,র সাইড। এই যেমন মনে করুন, তিনি গল্পগুজোব
ডাইনিঙ-রুমে বসে চেয়ার টেবিলে ছু. প্রিয়জনের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করতেন কি না,
খেতেন, না রান্নাঘরের বারান্দায় হাপু রিকাঁটা দিয়ে ছিমছাম ভাবে সায়েবী কায়দায়
সচকিত করে পর্বটি সমাধান করে সর্বশেষে স-হুপুস শব্দে মাদ্রাজী স্টাইলে পাড়া
ঢেকুর তুলতে তুলতে বাঙালী কায়দায় চটি ফটফটিয়ে কাবুলী কায়দায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে
খড়কের সন্ধানে বেরতেন?
কেউ তাঁকে প্রেমপত্র লিখলে তিনি কি করতেন? কিম্বা ভিহি শ্রীরামপুর ছুই
নম্বর বাই লেন তাদের কম্বল-বিতরণী সভায় তাঁকে প্রধা অতিথি করার জন্য
ঝুলোঝুলি লাগালে তিনি সেটা এড়াবার জন্য কোন্ পন্থা অব লম্বন করতেন?
কিম্বা কেউ টাকা ধার চাইলে?

ভালোই হল টাকা ধারের কথা মনে পড়ল।

'দেহলী'র উপরে থাকতেন তিনি, নিচের তলায় তাঁর নাতি দিনে ন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওরফে দিনুবাবু।

তাঁরই বারান্দায় বসে আশ-কথা-পাশ-কথা নানা কথা হচ্ছে। হতে হতে টাকা ধার নেওয়ার কথা উঠলো। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বুঝলি, দিনু, আমার কাছ থেকে একবার একজন লোক দশটাকা ধার নিয়ে গদ্গদ কণ্ঠে বললে, "আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলুম"।' সভায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা পয়েন্টটা ঠিক কি বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। আফটার অল্, গুরুদেবের পক্ষেও কালে-কস্মিনে কাঁচা রসিকতা করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

খানিকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গুরুদেব বললেন, 'লোকটার শতদোষ থাকলেও একটা গুণ ছিল। লোকটা সত্যভাষী। কথা ঠিক রেখেছিল। চিরঋণী হয়েই রইল।'

শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায় ইত্যাদি মুরুব্বীরা অট্টহাস্য করেছিলেন। আমরা, অর্থাৎ চ্যাংড়ারা, থামের আড়ালে ফিক্‌ফিক্ করেছিলুম।

এ গল্পটি আমি একাধিক লোকের মারফৎ পরেও শুনেছি। হয়তো তিনি গল্পটি একাধিক সভা-মজলিসে বলেছেন এবং গল্পটি আদৌ তাঁর নিজের বানানো না অন্যের কাছ থেকে ধার নেওয়া সে-কথাও হলফ করে বলতে পারবো না। কারণ কাব্যানুশাসনের টীকা লিখতে গিয়ে আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র বলেছেন, 'নাস্ত্যচৌরঃ কবিজনঃ নাস্ত্যচৌরো বণিগ্‌জনঃ—অর্থাৎ 'বড় বিদ্যা'টি বিলক্ষণ রপ্ত আছে স্যাকরার এবং কবি মাত্রেরই।

তা হক। মহাকবি হাইনরিষ্‌ হাইনে তাতে কণামাত্র আপত্তি না তুলে বলেছেন, 'যারা কবির রচনাতে 'নির্ভেজাল' অরিজিনালিটি খোঁজে তারা চিবাক মাকড়ের জাল, কারণ একমাত্র মাকড়ই তার জালটি তৈরি করে আপন পেটের মাল দিয়ে, ষোল আনা অরিজিনাল; আমি কিন্তু খেতে ভালবাসি মধু, যদিও বেশ ভালোভাবেই জানি মধুচক্রের প্রতিটি ফোঁটা ফুলের কাছ থেকে চোরাই মাল।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পের ভিতর আমার সবচেয়ে ভালো লাগে 'গুরুদেব-ভাণ্ডারে' কাহিনী। অবশ্য আমার মনে হয়, গল্পটির নাম 'ভাণ্ডারে-গুরুদেব' কাহিনী দিলে ভালো হয়, কারণ কাহিনীটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, ভাণ্ডারের একটি সৎকর্মের উপর। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগজ্জন সম্মুখে প্রকাশ করলেন তখন কালা আদমির কেরদানী বরদাস্ত না করতে পেরে ইংরেজ আবিষ্কারটার নামকরণ করলে 'আইনস্টাইন-বোস থিয়রি'। স্বয়ং আইনস্টাইন তখন নাকি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন ওটার নাম হয় হবে শুধুমাত্র 'বোস থিয়োরি' নয় 'বোস-আইনস্টাইন থিয়রি'। এ-সব অবশ্য আমার শোনা কথা। ভুল হলে পুজোর বাজারের বিলাস বলে ধার নেবেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইংরেজ পছন্দ করতো না বলে শান্তি-নিকেতন আশ্রমটিকে নষ্ট করার জন্য ইংরেজ একটি সূক্ষ্ম গুজোব বাজারে ছড়ায় —শান্তিনিকেতনের ইস্কুল আসলে রিফরমেটরি। অন্তত এই আমার বিশ্বাস।

খুব সম্ভব তারই ফলে আশ্রমে মারাঠি ছেলে ভাণ্ডারের উদয়।

ইস্কুলের মধ্য বিভাগে বীথিকা-ঘরে ভাণ্ডারে সীট পেল। এ ঘরটি এখন আর নেই তবে ভিতটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তারই সমুখ দিয়ে গেছে শালবীথি। তারই এক প্রান্তে লাইব্রেরি, অন্য প্রান্তে দেহলী। গুরুদেব তখন থাকতেন দেহলীতে।

দেহলী থেকে বেরিয়ে, শালবীথি হয়ে গুরুদেব চলেছেন লাইব্রেরির দিকে। পরনে লম্বা জোব্বা, মাথায় কালো টুপি। ভাণ্ডারে দেখামাত্রই ছুটলো তাঁর দিকে। আর সব ছেলেরা অবাক। ছোকরা আশ্রমে এসেছে দশ মিনিট হয় কি না হয়। এরই মধ্যে কাউকে কিছু ভালো-মন্দ না শুধিয়ে ছুটলো গুরুদেবের দিকে!

আড়াল থেকে সবাই দেখলে ভাণ্ডারে গুরুদেবকে কি যেন একটা বললে

গুরুদেব মৃদুহাস্য করলেন। মনে হল যেন অল্প অল্প আপত্তি জানাচ্ছেন। ভাণ্ডারে চাপ দিচ্ছে। শেষটায় ভাণ্ডারে গুরুদেবের হাতে কি একটা গুঁজে দিলে। গুরুদেব আবার মৃদুহাস্য করে জোব্বার নিচে হাত চালিয়ে ভিতরের জেবে সেটি রেখে দিলেন। ভাণ্ডারে এক গাল হেসে ডরমিটরিতে ফিরে এল। প্রণাম না, নমস্কার পর্যন্ত না।

সবাই শুধালে, 'গুরুদেবকে কি দিলি ?'

ভাণ্ডারে তার মারঠি-হিন্দীতে বললে, 'গুরুদেব কৌন্ ? ওহ্ তো দরবেশ হৈ।'

'বলিস কিরে, ও তো গুরুদেব হায়।'

'ক্যা 'গুরুদেব' 'গুরুদেব' করতা হৈ। হম্ উসকো এক অঠন্নী দিয়া।'

বলে কি ? মাথা খারাপ না বদ্ধ পাগল ? গুরুদেবকে আধুলি দিয়েছে !

জিজ্ঞেসবাদ করে জানা গেল, দেশ ছাড়ার সময় ভাণ্ডারের ঠাকুরমা তাকে নাকি উপদেশ দিয়েছেন, সন্ন্যাসী দরবেশকে দান-দক্ষিণা করতে। ভাণ্ডারে তাঁরই কথামত দরবেশকে একটি আধুলি দিয়েছে। তবে, হ্যাঁ দরবেশ বাবাজী প্রথমটায় একটু আপত্তি জানিয়েছিল বটে, কিন্তু ভাণ্ডারে তালেবর ছেলে সহজে দমে না, চালাকি নয়, বাবা, একটি পূরী অঠন্নী !

চল্লিশ বছরের কথা। অঠন্নী সামান্য পয়সা, এ-কথা কেউ বলেনি। কিন্তু ভাণ্ডারেকে এটা কিছুতেই বোঝানো গেল না যে তার দানের পাত্র দরবেশ নয়, স্বয়ং গুরুদেব।

ভাণ্ডারের ভুল ভাঙতে কতদিন লেগেছিল আশ্রম পুরাণ এ-বিষয়ে নীরব। কিন্তু সেটা এ-স্থলে অবান্তর।

ইতিমধ্যে ভাণ্ডারে তার স্বরূপ প্রকাশ করছে। ছেলেরা অস্থির, মাস্টাররা জ্বালাতন, চতুর্দিকে পরিত্রাহি আর্তরব।

হেড মাস্টার জগদানন্দবাবু এককালে রবীন্দ্রনাথের জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন। লেঠেল ঠ্যাঙানো ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। তিনি পর্যন্ত এই দুঁদে ছেলের সামনে হার মেনে গুরুদেবকে জানালেন।

আশ্রম-স্মৃতি বলেন, গুরুদেব ভাণ্ডারেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে ভাণ্ডারে, এ কি কথা শুনি ?'

ভাণ্ডারে চুপ।

গুরুদেব নাকি কাতর নয়নে বললেন, 'হ্যাঁরে ভাণ্ডারে, শেষ পর্যন্ত তুই

এসব আরম্ভ করলি? তোর মতো ভালো ছেলে আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। আর তুই এখন আরম্ভ করলি এমন সব জিনিস যার জন্ম সকলের সামনে আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছে। মনে আছে, তুই যখন প্রথম এলি তখন কি রকম ভালো ছেলে ছিলি? মনে নেই, তুই দান-খয়রাত পর্যন্ত করতিস? আমাকে পর্যন্ত তুই একটি পুরো আধুলি দিয়েছিলি। আজ পর্যন্ত কত ছাত্র এল গেল কেউ আমাকে একটি পয়সা পর্যন্ত দেয়নি। সেই আধুলিটি আমি কত যত্নে তুলে রেখেছি। দেখবি?'

* * *

তার দু'এক বৎসরের পর আমি শান্তিনিকেতনে আসি। মারাঠি সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় ভীমরাও শাস্ত্রী তখন সকালবেলার বৈতালিক লীড করতেন। তার কিছুদিন পর শ্রীযুত অনাদি দস্তিদার। তারপর ভাণ্ডারে।

চল্লিশ বছর হয়েগিয়েছে! এখনও যেন দেখতে পাই ছোকরা ভাণ্ডারে বৈতালিকে গাইছে,

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো সভ্য জাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোনো বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত হয়। এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তারা স্বভাবতঃ এবং ঐতিহ্যবশতঃ ধর্মানুরাগী। বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূলস্বরূপ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ না থাকলে সে তখন সবকিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।[১]

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যে সব হিন্দু এ শহরের গোড়াপত্তন-কালে ইংরেজের সাহায্য করে বিত্তশালী হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোন চর্চা ছিল না। বাঙলা গদ্য তখনো জন্মলাভ করেনি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোন উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ। তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল-পার্বণে যা সমারোহ করলো তা দেখে অধিকতর বিত্তশালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হল। এর শেষ-রেশ 'হুতোমে' পাওয়া যায়।

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বার বার ঘটে থাকে। এবং সমগ্রভাবে বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। গরীব দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থ নৈতিক মূল্য তো আছে বটেই তদুপরি এক যুগের অত্যধিক পাল-পার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

১। বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্যমুনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ-পশুহত্যা তখন সত্য-ধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছিল বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সর্বজনবোধ্য লোকায়ত প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষার শরণ নেন।

কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন ঐ ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশী ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন-আলোড়ন নিয়ে। এবং এই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (কঁৎ, মিল ইত্যাদি প্রশ্নের যুক্তিতর্কমূলক আলোচনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে ক্রিয়াকর্মাসক্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙালী সমাজের অগ্রণীগণ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি ইংরেজী শিখে ফেলেছেন এবং খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব, তার মহান আদর্শবাদ, সেই ধর্মে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা তাঁদের মনকে বার বার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে কি, আছে তো শুধু দেখতে পাই অন্তঃসারশূন্য পূজা-পার্বণ, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন চরম মূল্য লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পরিসমাপ্তিতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

হিন্দুশাস্ত্রের অতি সামান্য অংশও যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, এ সব কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। বস্তুতঃ জীবনসমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। এক-দিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন প্রলোভন, অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কাঠোর কঠিন আদেশ—এ দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহী হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে দেখিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এ সব তত্ত্ব যাঁরা জানতেন তাঁরা থাকতেন গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়াতেন টোল চতুষ্পাঠীতে এবং তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেননি বলে ওদের ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচলিত করে তুলেছে সে সংবাদও তাঁদের কানে এসে পৌঁছয়নি।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য, এই সব 'টোলো' 'বিটেল বামুনরা' যে শুধু পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মর্যাদা মহিমা অক্ষুন্ন রাখতে পারতো তা নয়, তারা যে কাণ্টহেগেলের চেলাদের সঙ্গে বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল—এ তত্ত্বটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

'হাতের কাছে পাইনে খবর,
খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর!'

লালন ফকিরের অর্থহীন গীত নয়।[১] এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু স্মার্ত নন, নৈয়ায়িকও ছিলেন, এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলবট নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে বিধানের সামাজিক মূল্যও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারতেন।

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণীজন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হয়। তাঁর ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙালী জাতির কি পরিমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাহ্মসমাজের কীর্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ এখনো শেষ হয়নি। বাঙালী সাধক, বাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠক সকলেই সে কথা স্বীকার করেছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—

এদানির ব্রাহ্মধর্ম যার ছড়াছড়ি।
তাহারেও বার বার নমস্কার করি॥

'ছড়াছড়ি' শব্দে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু ক্ষুদ্র তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও 'নমস্কার' করেছেন।

রাজা রামমোহন খৃষ্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলবী' ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে বস্তু সম্পূর্ণ অবান্তর এমন কি অন্তরায়, সেই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

রাজা জানতেন, সে যুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খৃষ্টান মিশনারীর সামনে 'ক' অক্ষরে 'কৃষ্ণনাম' স্মরণে 'একঘটি'[২] চোখের জল ফেললেই আপন ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—খুব বেশী হলে, ভদ্র মিশনারী হয়ত তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে হিন্দুর ষড়্‌দর্শন, বুদ্ধ

১। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি ;

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃঃ।

২। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কথার আড়।

এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বেদ-বেদান্তের অখণ্ড দিব্যদৃষ্টি।

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দুধর্মের নব উন্মাদনা আনতে হলে রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের কোন্ কোন্ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার করতেন সে কথা বলা শক্ত; কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে যুগের কলিকাতাবাসী সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ্ থেকেই শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত, এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় খ্রীষ্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার উদ্দেশ্য নয়,—অনুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কী পণ্ডিত অলবীরূনী, মোগল সূফী দারাশীকুহ্ (ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)[১] এবং জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন।

ধর্মের যে সব বাহ্যানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে, এবং সে সংগ্রামের জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করলেন হিন্দু স্মৃতি থেকেই! এ স্থলে রাজা বিশ্বজনীন যুক্তিতর্ক ব্যবহার না করে প্রধানতঃ ব্যবহার করলেন হিন্দু-শাস্ত্রসম্মত ন্যায় এবং উদাহরণ। রাজা প্রমাণ করলেন যে তিনি দর্শনে যে রকম বিদগ্ধ, ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও অনুরূপ স্মার্ত মল্লবীর।

শাস্ত্রালোচনায় ঈষৎ অবাস্তর হলেও এস্থলে বাঙলা সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় একটি বস্তুর দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাঙলা ভাষাতে। পদ্য এ সব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তার-ই

১। দারা তাঁরা অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলে: "হে প্রভু, তুমি তোমার সুন্দর মুখ কুফ্র্ (অবিদ্যা) কিম্বা ইমান (বিদ্যা) দু'পাশের কোনো অলকগুচ্ছ (জুল্ফ্) দিয়ে ঢেকে রাখোনি।" এই শ্লোক ঈশোপনিষদের 'অন্ধং তমঃ প্রাবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥'-রই অনুবাদ।

মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে বাঙলা গদ্য লেখা হয়নি এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু হিন্দু-ধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ষণ মন্থনের ফলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গদ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনা বহুবার ঘটেছে; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাবীরের কৃপায় অর্ধ-মাগধী। হজরৎ মুহম্মদের কৃপায় আরবী গদ্য, লুথারের কৃপায় জর্মন গদ্যের সৃষ্টি। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার হয়; তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিম্বা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়,[১] এবং সে আন্দোলনকে বাধ্য হয়েই গণ-ভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয় বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (Folk religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল।[২] প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজও যদি কেউ ব্রাহ্ম-মন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্মসাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে হবে উপনিষদ-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনো প্রকারের উন্নতি করতে পারেননি। এমন কি গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কথা প্রায় কখনোই শুনিনি। বৃন্দাবনের রসরাজ-রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোনো ব্রাহ্ম কখনো কোনো দৃষ্টান্ত আহরণ করেননি।

১। বস্তুতঃ, সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম পৃথিবীতে কোনো মহাপুরুষ কখনোই আরম্ভ করেন নি। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন। মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বা জিন। খৃষ্ট বলেন তিনি বিধির বিধান ভাঙতে আসেন নি—তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে। হজরৎ মুহম্মদ বলতেন তাঁর পূর্বে বহু সহস্র পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ এঁদের কেউ বলেন নি, আমি প্রথম। প্রায় সকলেই বরঞ্চ বলেছেন, আমিই শেষ।

২। একটা অবিশ্বাস্য গল্প শুনেছি; কোনো ব্রাহ্ম ভক্ত নাকি কদম্বতরুকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায়, হিন্দুরা ব্রাহ্মদের 'গোঁড়ামি' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা পোষণ করতেন।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি. আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রাহ্মও তা, আমি হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বার বার নমস্কার করি।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। এ যুগেও তার উদাহরণ পাইনি। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হৃদ্যতা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্ম পরিবারে হিন্দু চাকর-বাকরকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখিনি। মুসলমান খৃষ্টানরা সর্বদাই করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয় ব্রহ্মমন্ত্র সর্বজনীন, কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে কোনো কারণেই হোক সর্বজনকে আহ্বান জানাতে পারেননি। মুসলমানের নমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশী, হিন্দুর সংকীর্তনে ভাবোল্লাসে নৃত্য করে 'নিম্নশ্রেণী'র প্রচুর হিন্দু. আর মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-সম্মেলনে ব্রাহ্ম চাকর-নফর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তার জন্য আমি ব্রহ্মবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি না। এঁরা অক্ষম ছিলেন, একথা আমি কখনো স্বীকার করবো না। আমার মনে হয়, এঁরা প্রধানতঃ সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে যে আমাদের মত বহু হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে হিন্দুধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন হয় দীক্ষা নিয়েছেন, কিম্বা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরীব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কি না এ বিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিত জনেরই শাস্ত্রাধিকার।

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তা হলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিতজনকেও শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদ করতে হয়।[১]

* * * *

ঠিক এই সময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সব কিছুই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তিতর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধু-সন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ বস্তুটি যে ষষ্ঠেন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসত্ত্বেও যারা তার বিচার করে তাদের নিয়ে মৃদু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন—

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী,
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি।

যার যেমন মাপকাঠি। স্যাকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে চায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব—একাধিক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল।[২]

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার এক ঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে তোমার কি হবে?[৩]

তাই মা ভৈঃ। যারা বলে আমাদের মত পাপীতাপীর অধিকার নেই

১। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মফল ভোগ করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এ স্থলে অবান্তর।

২। আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, 'যে জন ডুবলো, সখী, তার কি আছে আর বাকি গো?' ঠাকুরও প্রায়ই গাইতেন 'ডোব, ডোব, ডোব।'

৩। এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 'মাই কাপ্ ইজ স্মল; বাট্ আই ড্রিঙ্ক অফনার।'

পরমহংসের মত মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার—তারা ভুল বলে। অধিকার আমাদেরই—এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীন প্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোঝা যায় এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 'নিখিরকিচ'—চাঁচা-ছোলা। যেন এইমাত্র তৈরী হয়েছে কাঁসার ঘটিটি—কোন জায়গায় টোল পড়েনি।

এঁর মত সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এঁর ভাষার সঙ্গে সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য খৃষ্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গীর। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য।' এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোনো বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'তার জাঁতায় যাই ফেলো না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হ'ল। সময়মত ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন কি, যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু-কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরনের 'বেগে'র প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁর উপমাটির উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন), আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গী সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। কিন্তু যেখানে শুদ্ধমাত্র রুচির প্রশ্ন, সেখানে তিনি 'ধোপদুরস্ত' 'ফিস্টফাট' হবার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার 'ছুঁৎবাই'

রোগ আমরা পেয়েছিলুম ভিক্টোরিয় প্যুরিটানিজ্‌ম থেকে—তখন কে জানতো পঞ্চাশ বছর যেতে না যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের 'ভণ্ডামি' লণ্ডভণ্ড করে দেবেন।[১]

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পূজা করে প্রধানতঃ কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখলে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন।

অথচ 'দূরের কথা' বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে, পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এ-তিন মার্গ তিনি অবস্থাভেদে একে ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সব কিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন, 'কিন্তু যতক্ষণ পযন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে পারো নি, ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না।' 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

'কি রকম জানো. যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি', 'তুমি', 'জগৎ', এ সবের খবর থাকে না।'

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলেছেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী।' যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'। তোমাদের যদি

১। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে দু'রকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। 'সীতার বনবাসে'র ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্যামাকে বিধবা বিবাহের শত্রুদের বিপক্ষে ক্ষেপাতে চেয়েছেন, সেখানে 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই বেনামীতে, 'ফাজিল-চালাক,' 'দিলদরিয়া তুখোড় ইয়ার', 'তার একটি বেদড়া মন্ত্রী আছে—এটি তারই ত্যাঁদড়ামি,' 'লোকটা লক্ষ্মীছাড়া বক্কেশ্বর আনাড়ির চূড়ামণি বে-অকুফের শিরোমণি।' ইত্যাদি 'গ্রাম্য' বাক্য পরমানন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যে সব আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (!) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনও সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে।[১] আর একটি কথা- তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো, কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। ব'লো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।"[২]

১। শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপ কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম ;—

"মৃত্যুরূপা মাতা"

"নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণবায়ু-বেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়। ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর !—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !
করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

ইংরেজিতে এর প্রথম ছত্র "The Stars are blotted out !"—আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪) ? কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

২। ডগমাটিজম্ না করে মনকে খোলা রাখা এবং জানা-অজনার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা এর উৎকৃষ্ট প্রকাশ কেনোপনিষদে :—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥" ২।২

জনগণপূজ্য শক্তির সাকার সাধনা ('পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বথা বর্জনীয়—এটাতে তাচ্ছিল্য এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে কিন্তু প্রশ্ন, জড়সাধনার অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না ?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বার বার সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি 'মতুয়া' কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।

বস্তুতঃ একটি চরম সত্য আমাদের বার বার স্বীকার করা উচিত : যেখানেই যে কোনো মানুষ যে কোনো পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই সম্মান জানাতে হয়। এমন কি ক্ষুদ্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করে (হায়, কলকাতায় সরস্বতীপূজার বাহ্যাড়ম্বর দেখে অনেক সময় মনে হয়, এরাই বুঝি এ যুগে দেবীর একমাত্র সাধক) সেই শ্রদ্ধাটিকেও মানতে হয়,—গাছের পাতা, জলের ফোঁটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তখন সে ঠেকানোরও বিলক্ষণ মূল্য আছে। গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাষার বলা হয়েছে।

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কি ? বাঙলাদেশে আজ আর ক'জন লোক নিরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শক্ত—কারণ সে পূজা হয় গৃহকোণে, নির্জনে। আর কলকাতার বারোয়ারী সাকার পূজায় যা আড়ম্বর তা দেখে বাঙলার কত গুণীজ্ঞানী যে বিক্ষুব্ধ হন তার প্রকাশ খবরের কাগজে প্রতি বৎসর দেখি। এইমাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য আছে—তাই আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, 'কিন্তু কি ভয়ঙ্কর স্ট্রেন করে এ স্থলে সে সত্যটি স্বীকার করি।'

সাকার নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে তা আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাধানের সামাজিক মূল্য কি ?

'আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি ; অর্থাৎ 'জানি না' ইহাও মনে করি না, এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।'—গম্ভীরানন্দ

নয় পৃষ্ঠার পাদটীকা পুনরায় দ্রষ্টব্য।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী সমাজে সমান অংশীদার। এঁদের ধর্মাচরণ যা-ই হোক না কেন, সমাজে তাঁরা মেলামেশা করেছেন অবাধে। একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলামেশা না থাকলে খৃষ্টান মাইকেল, মুসলমান মুশরফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীন বাঙলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। সমঝদার ও রসিক জনের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহ লাভ না করে কম কবিই এ সংসারে সার্থক কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং এঁদের সকলেরই উৎসাহী পাঠক এবং গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধানতঃ হিন্দুরাই।[১]

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি—'মহতী বিনষ্টি' হয়; এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সে যুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সে যুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুন্ন হয় নি? তবে কেন ঐ কারণেই ব্রাহ্মে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে?

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মূল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেন নি। তাই বার বার দেখি, তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বার বার দেখি, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালী-কাল্টে কন্‌ভার্ট' করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।[২]

১। পূর্ববর্তী যুগে পরাগল, ছুটি খাঁর মত মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন বলেই হিন্দুরা মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমুখ বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন-মুসলমান কবিগণ' সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

২। এ বিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বান্দা' ছিলেন তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাবেন, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে। পাঠক তখন 'নাছোড়বান্দা'র সত্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন এ কখনই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, অন্য সত্যও সর্বজনবিদিত —কামিনী-কাঞ্চনে পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থ-সমস্যা আপন সত্তায় (*per se*) তাঁর সামনে উপস্থিত হয় নি। যারা মুখ্যতঃ অর্থ কামনা করে, রামকৃষ্ণদেব তো তাঁদের উপদেষ্টা নন। যাঁরা মুখ্যতঃ ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর তিনি তাঁদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহু বার বলেছেন, 'কলিকালে মানবের অন্নগত প্রাণ।' এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণনীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্য কোন চিন্তার স্থান আর তার মস্তকে নাই। তবু যাঁরা ধর্মে অনুরক্ত তাঁরা বার বার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, 'উপায় কি ?'

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তা হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে জগৎ মায়া মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখির মতো দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায়। অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে সচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন জোটাবে আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যে সব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না,—যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী তাঁদের বার বার বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলকেই এ কথা বলেছেন, এই জন্মেই যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছতে চায়—রাখাল, নরেন্দ্রের মত যারা জন্মাবধি জীবন্মুক্ত, তাদের ক'জন বাদ দিলে আর ক'টি প্রাণী সে স্তরে পৌঁছতে পারবে সে বিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—তাদের হতে হবে নিরঙ্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। এ-কথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি,

তবে বলবো, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ—পরম পুরুষ। কোনো মহাপুরুষকে যদি দম্ভভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করবো। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোন চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয় নি। এ তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

*　　*　　*　　*

যে পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগল্‌ভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতূহলবশতঃ স্বতঃই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ তো হল মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জ্বল রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু যেখানে তিনি একা—তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাঙলায়, তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?'

এর উত্তরে বলবো, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারোরই নেই। এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য। রামকৃষ্ণের সমকক্ষ জনই এর উত্তর দিতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছনর পরও কোনো কোনো মানুষ লোকহিতার্থে এ সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ শুকদেবাদি।' এ কথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি, এ-কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান, এ রকম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এ যাবৎ কেউ নির্মাণ করেন নি।

*　　*　　*　　*

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই।

পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গীর মত পরে আল্লা আল্লাও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খৃষ্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে-কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এল কোথা থেকে। বিশেষতঃ যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনোবাক্যে সে-ই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সম্যুলার দেখিয়েছেন, ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি করেন

তখন তিনি বলেন,—'হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।' আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই,—'হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।' অর্থাৎ ঋষি যখন যে দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহু-ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সম্যুলার এর নূতন নাম করেছিলেন, 'হেনোথেয়িজম।'

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থাই বরণ করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন আল্লা আল্লা করেছেন তখন আল্লাই পরমাল্লা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পেয়েছিলেন।

কোনো বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সব কিছুর অবহেলা করেননি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ যুগের হিন্দু সম্বন্ধে এ কথা হয়ত খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাহ্য করেনি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান, ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে॥

১৯৫৪

পুষ্পধনু

রস কি ?

অর্থাৎ যখন কোনো উত্তম ছবি দেখি, কিংবা সরেস সঙ্গীত শুনি, অথবা ভালো কবিতা পড়ি, কিংবা নটরাজের মূর্তি দেখি, তখন যে রসানুভূতি হয় সে রস কি, এবং সৃষ্ট হয় কি প্রকারে ?

এ রসের কাছাকাছি একাধিক রস আছে। গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, ধাঁধার উত্তর বের করে, মনোরম সূর্যোদয় দেখে, প্রিয়াকে আলিঙ্গন করে যে সব রসের সৃষ্ট হয় তার সঙ্গে যে পূর্বোল্লিখিত রসের কোনোই মিল নেই সে কথা জোর করে বলা চলে না। এমন কি,—শোনা কথা—বার্ট্রাণ্ড রাসল্ নাকি বলেছেন গণিতের কঠিন সমস্যা সমাধান করে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন সেটি নাকি হুবহু কলারসের ই। কিন্তু এ সব রসে এবং অন্যান্য রসে পার্থক্য কি সে আলোচনায় এবেলা নেমে উঠলে ওপারে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ, প্রকাশশক্তি ততোধিক সীমাবদ্ধ। (তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আমি আদৌ লিখতে যাচ্ছি কেন ? উত্তরে সবিনয় নিবেদন. বহুদিন সাহিত্য রচনা করার ফলে আমার একটি নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী জমায়েৎ হয়েছেন ; এঁদের কেউই পণ্ডিত নন—আমিও নই—অথচ মাঝে-মধ্যে এঁরা কঠিন বস্তুও সহজে বুঝে নিতে চান এবং সে কর্ম আমার মত বে-পেশাদারী—নন-প্রফেশনালই—করতে পারে ভালো। রচনার গোড়াতেই এতখানি ব্যক্তিগত সাফাই হয়তো ঠিক মানানসই হল না, তবু পণ্ডিতজন পাছে আমার উপর অহমিকা দোষ আরোপণ করেন তাই সভয়ে এ ক'টি কথা কইতে হল)।

রস কি, সে আলোচনা অল্প লোকেই করে থাকেন। আলঙ্কারিকের অভাব প্রায় সর্বত্রই। কারণ রসের প্রধান কার্যকারণ আলোচনা করতে হলে অন্তত দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একদিক দিয়ে রসবোধ, অন্যদিক দিয়ে রসকষহীন বিচার বিবেচনা যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা। তাই এর ভিতর একটা দ্বন্দ্ব লুকনো রয়েছে।

যারা রসগ্রহণে তৎপর তারা তর্কের কিচিরমিচির পছন্দ করে না, আর যারা সর্বক্ষণ তর্ক করতে ভালোবাসে তারা যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' হয়ে রসিকজনের ভীতির সঞ্চার করে সে তো জানা কথা।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশে কিন্তু কখনও আলঙ্কারিকের অনটন হয়নি। ভরত থেকে আরম্ভ করে, দণ্ডিন্, মম্মট, ভামহ, হেমচন্দ্র, অভিনব গুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তহীন নির্ঘণ্ট বিশ্বজনের প্রচুর ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, তাঁকে যখন রাস্‌ল্ প্রশ্ন শোধান, রস কি, হোয়াট ইজ আর্ট, তখন তিনি এঁদের স্মরণে রাস্‌লকে প্রচুর নূতন তত্ত্ব শোনান। অন্য লোকের মুখে শুনেছি, রাস্‌ল্ রীতিমত হকচকিয়ে যান।

বিদেশী আলঙ্কারিকদের ভিতর জর্মন কবি হাইনরিষ হাইনের নাম কেউ বড় একটা করে না। কারণ তিনি অমিশ্র অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করেননি। জর্মন কবিদের নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝে রস কি তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন, এবং রস কি তার সংজ্ঞা না দিয়ে তুলনার মারফৎ, গল্পচ্ছলে সব কিছু অতি মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে রকম কোনো কিছু বলতে গেলে সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি না করে গল্প বলে জিনিসটা সরল করে দিতেন অনেকটা সেইরকম!

বাগদাদের শাহ্-ইন্-শাহ্, দীনদুনিয়ার মালিক খলীফা হারুন-অর্-রশীদের হারেমের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, খলীফার জিগরের টুকরো, চোখের রোশনী রাজকুমারীটি ছিলেন 'স্বপনচারিণী', অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন।

গভীর নিশীথে একদা তিনি নিদ্রার আবেশে মৃদু পদসঞ্চারণে চলে গিয়েছেন প্রাসাদ-উদ্যানে। সখীরা গেছেন পিছনে পিছনে। রাজকুমারী নিদ্রার ঘোরে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সম্পূর্ণ মোহাবস্থায় ফুল আর লতাপাতা কুড়োতে আরম্ভ করলেন আর মোহাবস্থায়ই সেগুলো অপূর্ব সমাবেশে সাজিয়ে বানালেন একটি তোড়া। আর সে সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয়ে গেল একটি নবীন বাণী, নূতন ভাষা। মোহাবস্থায়ই রাজকুমারী তোড়াটি পালঙ্কের সিথানে রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙতে রাজকুমারী দেখেন একটি তোড়া যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সখীরা বললেন, ইটি তাঁরই হাতে তৈরী। কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। এমন কি ফুলপাতার সামঞ্জস্যে যে ভাষা যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে সেটিও তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছেন না—আবছা আবছা ঠেকছে।

কিন্তু অপূর্ব সেই পুষ্পস্তবক! এটি তাহলে কাকে দেওয়া যায়? যাঁকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। খলীফা হারুন-অল্-রশীদ। খোজাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, এটি তুমি আর্যপুত্রকে (খলীফাকে) দিয়ে এসো।'

খোজা তোড়াটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'ও হো হো, কী অপূর্ব কুসুমগুচ্ছ! কী সুন্দর গন্ধ, কী সুন্দর রঙ! হয় না, হয় না, এ রকম সঞ্চয়ন সমাবেশ আর কোনো হাতে হতে পারে না।'

কিন্তু সে সামঞ্জস্যে যে বাণী প্রকাশিত হয়েছিল সে সেটি বুঝতে পারলো না। সখীরাও বুঝতে পারেন নি।

খলীফা কিন্তু দেখা মাত্রই বাণীটি বুঝে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দেহ শিহরিত হল। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। অভূতপূর্ব পুলকে দীর্ঘ দাড়ি বয়ে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু বইতে লাগলো।

এতখানি গল্প বলার পর কবি হাইনরিষ হাইনে বলছেন, 'হায় আমি বাগদাদের খলীফা নই, আমি মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর নই, আমার হাতে রাজা সলমনের আঙটি নেই, যেটি আঙুলে থাকলে সর্বভাষা, এমন কি পশুপক্ষীর কথাও বোঝা যায়, আমার লম্বা দাড়িও নেই, কিন্তু পেরেছি, পেরেছি, আমিও সে ভাষা সে বাণী বুঝতে পেরেছি।'

এ স্থলে গল্পটির দীর্ঘ টীকার প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি সে শক্তি আমার নেই। তাই টাপেটোপো ঠারেঠোরে কই।

রাজকুমারী = কবি; ফুলের তোড়া = কবিতা; ফুলের রঙ পাতার বাহার = তুলনা অনুপ্রাস; খোজা = প্রকাশক-সম্পাদক-ফিলিম-ডিস্ট্রিব্যুটর (তাঁরা সুগন্ধ সুবর্ণের রসাস্বাদ করতে পারেন, কিন্তু 'বাণীটি' বোঝেন না); এবং খলীফা = সহৃদয় পাঠক!

মরহুম মৌলানা

মরহুম (স্বর্গত) মৌলানা আবুল-কালাম মহী-উদ্দীন আহ্‌মদ অল্‌ আজাদ সম্ভ্রান্ত বংশের যোগ্য সন্তান। এ বংশের পরিচয় এবং বিবরণ বাদশা আকবরের আমল থেকে পাওয়া যায়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এঁর পিতা জড়িয়ে পড়েন। দিল্লীর উপর ইংরাজের বর্বর অত্যাচার আরম্ভ হলে পর তিনি তাঁর অন্যতম ভক্ত রামপুরের নবাবের সাহায্যে মক্কাশরীফে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি এক আরব কুমারীকে বিবাহ করেন। আবুল কালাম এই বিবাহের সার্থক সন্তান।

তাঁর মাতৃভাষা আরবী, পিতৃভাষা উর্দু। পরবর্তী যুগে তিনি ফার্সী এবং তুর্কীতেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য সঞ্চয় করেন। ইংরিজি থেকেও তিনি সে সঞ্চয়ে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তবে এদেশে ফেরার পর তিনি উর্দু সাহিত্যের এমনি একনিষ্ঠ সাধক ও প্রেমিক হয়ে যান যে শেষের দিকে আরবী বা ফার্সীতে নিতান্ত বাধ্য না হলে কথা বার্তা বলতেন না।

তাঁর বয়স যখন দশ তখন তাঁর পিতা ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। সমগ্র ভারতবর্ষেই তাঁর বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। এই কলকাতা শহরেই তাঁর প্রচুর অনুরাগী শিষ্য ছিলেন এবং তাঁদেরই অনুরোধে তিনি এখানে স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করেন। পুত্র আবুল কালাম এখানেই তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর পরলোকগমনের পর বেতারে যে একাধিকবার বলা হয়, তিনি মিশরের অল-আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন সে সংবাদ ভুল। উপরন্তু মৌলানা সাহেব নিজেকে সব সময়েই কলকাতার অধিবাসী ও বাঙালী বলেই পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলা তিনি বলতেন না, কিন্তু বাঙলা কথোপকথনের মাঝখানে তিনি উর্দুতে প্রশ্নোত্তর করতেন এবং কিছুক্ষণ পর কারোরই খেয়াল থাকতো না যে তিনি অন্য ভাষায় কথা বলছেন।

চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি 'লিসান উল্-সিদ্‌কে' ('সত্য-বচন') নামক কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁর 'অল্-হিলাল' ('অর্ধচন্দ্র') পত্রিকা ইংরেজের মনে ভীতির সঞ্চার করতে আরম্ভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর কাগজ ইংরেজের শত্রু তুর্কী এবং মুসলিম বিশ্ব-আন্দোলনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করার ফলে তাঁকে অন্তরীণ হতে হয়। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধী ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং সে আন্দোলনের সঙ্গে সাদ্ জগলুল্ পাশার মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার তুর্কীর নবজাগরণের সঙ্গে সেতু নির্মাণ করেন।

এর পরের ইতিহাস ভারতীয় মাত্রই জানেন।

শ্বেত সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিশ্ব-মুসলিম প্রেম মৌলানা আজাদের পরিবারে অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে গণ্য করা হ'ত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন মক্কায়— যেখানে হজ্ উপলক্ষে বিশ্বের তাবৎ মুসলিম প্রতি বৎসর সম্মিলিত হয়ে প্রাচ্য ভূমি থেকে কি করে শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেত-স্বৈরাচার দূরীভূত করা যায় তার পরিকল্পনা করতো এবং ভারত, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে আপন আপন কর্তব্য ও জিম্মাদারী ভাগ করে দেওয়া হত। এ-পরিকল্পনা কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না বলে একে ন্যাশনালিজম না বলে প্যান্-ইস্লামিজম (বিশ্ব-মুসলিম-সংহতি) নামে পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই সুপরিচিত ছিল। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মৌলানা এ-মন্ত্রই অহরহ শুনেছিলেন।

কলকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৌলানার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এ-কথা সত্য যে বিশ্ব মুসলিমের প্রতি তাঁর দরদ কখনো শুকিয়ে যায়নি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস হয়ে উঠল স্বদেশ-প্রেম। উর্দু ভারতবর্ষের ভাষা। তাঁর মাতৃভাষা আরবীকে তাঁর জীবনাদর্শ এবং রাজনৈতিক সাধনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ না করে তিনি সর্বান্তঃকরণে বরণ করে নিলেন উর্দুকে। এ বড় সহজ কুরবানী বা আত্মবিসর্জন নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগেই শুধু নয়, আজও দেখতে পাই বহুলোক স্বার্থলাভের জন্য স্বদেশী ভাষা বর্জন করে বিদেশী ভাষার সাধনা করেন এবং আমাদের মত বাঙাল তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না বলে আমাদের প্রতি রুষ্ট হন।

এবং সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, এই উর্দু গ্রহণের জন্য জীবন সায়াহ্নে মৌলানাকে আবার অকরুণ কটুবাক্য শুনতে হলো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীর কাছ থেকে।

হিন্দী ভাষা কেন রাতারাতি ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষার কণ্ঠরুদ্ধ করে 'জাতীয় ভাষা' রূপে জগদ্দল প্রতিমার মত ভারতের মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাচ্ছেন না, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শিশু ভাষাগুলোকে কেন কচি কচি পাঁঠার মত তাঁর সামনে বলি দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ অনুসন্ধান করে তাঁরা আপন 'বুদ্ধিতে' আবিষ্কার করলেন 'হিন্দী-বিদ্বেষী' 'হিন্দী ভাষাকা কট্টর দুশ্‌মন্‌' মৌলানা আজাদকে। 'যেহেতু মৌলানা উর্দুভাষী তাই তিনি শিক্ষামন্ত্রীরূপে হিন্দীর প্রচার এবং প্রসার কামনা করেন না'—এই হ'ল তখন তাঁদের 'যুক্তি'। হিন্দী যে দুর্বল, কমজোর ভাষা সে-কথা স্মরণ করবার অস্বস্তিকর প্রয়োজন কেউ বোধ করলেন না। পণ্ডিত নেহরুও যে উর্দুভাষী এ-কথা বলতে তাঁরা সাহস পেলেন না—এ-কথা বললে উভয়ের হৃদ্যতা বেড়ে যাবে যে!

মাত্র একবার মৌলানা লোক-সভায় তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। এবং যাঁরা সেদিন এই সভায় ছিলেন তাঁরা সবাই দেখেছিলেন মৌলানার আবেগময়ী আন্তরিক বক্তৃতার ফলে প্রতিপক্ষ কি রকম লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন—শত্রু মিত্র কারো দিকেই মুখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত সেদিন তাঁদের আর হয়নি।

জগলুল পাশা, কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে মৌলানার পত্রবিনিময় সব সময়ই ছিল, কিন্তু মৌলানা ক্রমে ক্রমে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। সে ইতিহাস লেখবার শক্তি আমার নেই; আমি শুধু এ-স্থলে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মক্কা শরীফের প্যান-ইসলামী বালক যৌবনে পরিপূর্ণ জাতীয়তাবাদী হয়ে গেল। মৌলানার যে সব বিপক্ষদল একদা মুসলিম জাহানের স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা পর্যন্ত আজ কঠিন অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়ে বুঝতে পেরেছেন, সে স্বপ্ন গেছে—এখন তাঁরা পুরো পাকিস্তানী হয়ে গিয়ে জাতীয়তা-বাদের আদর্শই বরণ করেছেন। দুঃখ এই, তাঁরা এ আদর্শটি কয়েক বৎসর আগে বরণ করে নিলেই তাঁদের মঙ্গল, আমাদের মঙ্গল, সকলেরই মঙ্গল হত।

এ-স্থলে কিন্তু আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত।

স্বরাজলাভের পর মৌলানা তাঁর জাতীয়তাবাদ বিশ্ব-মানবের কল্যাণে নিয়োগ করেছিলেন। দেশ পর্যটন মৌলানা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, কিন্তু বিশ্বজনের সঙ্গে সক্রিয় যোগ স্থাপনার জন্য তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে পাকিস্তান ইরান হয়ে ইয়োরোপে যান—পূর্বে বহুবার বহু দেশে নিমন্ত্রিত হয়েও যাননি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, জাতিসম্মেলন (ইউ. এন. ও.) এবং তার ভিন্ন ভিন্ন

শাখার যে সব প্রতিনিধি ভারতে এসেছেন তাঁরা তাঁদের সর্বোত্তম সখারূপে চিনতে শিখলেন মৌলানা আজাদকে। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে মৌলানা ইংরেজের বিরুদ্ধে তিক্ততম লড়াই লড়েছেন আজীবন, তাঁর ভিতর সে তিক্ততা আর নেই। ইংরেজ হোক, মার্কিন হোক আর রুশই হোক, যে জন বিশ্বকল্যাণের জন্য অগ্রসর হয়, তার বহু দোষ থাকলেও সে আজাদের বন্ধুজন। এবং আরো আশ্চর্য! ইংরেজ দেখে, মৌলানা ইংরেজি না বলেও ইংরেজের মিত্র, রাশা দেখে, তার ভাষা না জেনেও অন্যের তুলনায় মৌলানা রাশাকে চেনেন অনেক বেশী। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেন উর্দুতে, কিন্তু সে উর্দু তো উর্দু নয়, সে-উর্দু বিশ্বপ্রেমের সর্বজনীন ভাষা, কিংবা বলবো, বিশ্বপ্রেমের ভাষা উর্দুর মাধ্যমে স্বপ্রকাশ হল। একদা তিনি আরবী বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করেছিলেন ; তখন তিনি উর্দু বর্জন করে অন্য এক ভাষা গ্রহণ করেছেন, যার নামকরণ এখনো হয়নি, কারণ সে ভাষাতে কথা বলতে অমরা এখনো শিখিনি।

অথচ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী চলতো তিনখানি ত্রৈমাসিক। প্রথমখানি আরবীতে—আরবভূমির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপনা ও প্রাচীন যোগ দৃঢ়তর করার জন্য ; দ্বিতীয়খানা ফার্সীতে—ইরান ও আফগানিস্থানের জন্য ; তৃতীয়খানা ইংরিজিতে—বৌদ্ধজগতের সঙ্গে যোগস্থাপনা করার জন্য (বৌদ্ধভূমি মাত্র এক কোণে একটি ভাষায় আশ্রিত নয় বলে তিনি মাধ্যমরূপে ইংরিজি গ্রহণ করেছিলেন)। এই তিনটি পত্রিকাই ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল ফর কালচারালরিলেশন্স দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয় এবং মৌলানা ছিলেন তার প্রধান। শুধু প্রধান বললেই যথেষ্ট বলা হয় না—কোন্ দেশে ক'খানি পত্রিকা যাবে সেটুকু পর্যন্ত তাঁর নির্দেশনুযায়ী হত। আজ ভাবি, এ-সব কটি পত্রিকার নীতি নির্দেশ, মানরক্ষা, তাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এমন সর্বগুণ মেশানো আরেক পণ্ডিত পাওয়া যাবে কোথায়? ভারতবর্ষের ভিতরে, বাইরে ?

বস্তুত আসলে এ-লোকটি হৃদয় এবং মস্তিষ্কের অন্তস্তলে ছিলেন পণ্ডিত। স্বাধীন মক্কা ত্যাগ করে পরাধীন ভারতে না এলে তিনি যে রাজনীতির চতুঃ-সীমানায় যেতেন না, সে কথা আমি স্থির নিশ্চয় জানি। স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি জ্ঞানমার্গেই ফিরে যেতেন কিন্তু দেশে তখন (এবং এখনো) উপযুক্ত লোকের অভাব। মৌলানা কখনো কর্তব্য অবহেলা করতে চাইতেন না। এমন কি যখন তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ মুখর হয়ে উঠতেন, এবং আমরা ভাবতুম তিনি

পদত্যাগ করলেই পারেন, তখনো তিনি কর্তব্যবোধের দায়েই আপন কাজ করে যেতেন—লোকনিন্দার তোয়াক্কা-পারোয়া না করে। পূর্বেই বলেছি, মাত্র একবার তিনি হিন্দী-ওলাদের কর্কশ-কণ্ঠে ব্যথিত হয়ে আপন কাহিনী নিবেদন করেছিলেন। এ-অবসরে আরেকটি ঘটনা মনে পড়লো। সেটা কিন্তু কিঞ্চিৎ হাস্যরসে মেশানো।

বিরুদ্ধ দল শিক্ষা-দফতরের বিরুদ্ধে দুনিয়ার তাবৎ অভিযোগ-ফরিয়াদ জটলা করে শেষটায় বললে, 'শিক্ষা-দফতরের দ্বারা কিছুই হবে না—তাদের মগজের বাক্সটি (ব্রেন-বক্স্‌টি) একদম ফাঁপা।'

মৌলানা স্পর্শকাতর লোক—পণ্ডিতগণ সচরাচর তাই হন। উষ্মা প্রকাশ না করে তিনি কিন্তু দাঁড়ালেন হাস্যমুখে। বার কয়েক ডান হাত দিয়ে মাথার ডান দিক চাপড়ে বললেন, 'না জী, এখানে তো আছে,' তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে দীর্ঘ আগুলফলম্বিত আচকনের ডান পকেটে থাবড়া মারতে মারতে বললেন, 'এখানে নেই, এখানে কিছুই নেই।' অর্থাৎ মগজে মাল যথেষ্ট আছে, কিন্তু পকেটে কিছুই নেই। তার আরো সরল অর্থ, কেবিনেট শিক্ষা-বিভাগকে যথেষ্ট পয়সা দেয় না।

পূর্বেই বলেছি, মৌলানা আসলে পণ্ডিত। কর্তব্যের তাড়নায় তিনি প্রবেশ করেছিলেন রাজনৈতিক মল্লভূমিতে অতি অনিচ্ছায়। তাঁর সে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে, কারণ তাঁর সে পাণ্ডিত্য-সায়রে সন্তরণ করার মত শক্তি আমার নেই।

আরবী এবং সংস্কৃত জ্ঞানচর্চায় বহু সাদৃশ্য রয়েছে। তার প্রধান মিল, উভয় সাহিত্যের পণ্ডিতগণই অত্যন্ত বিনয়ী। কারো কোনো নূতন কিছু বলার হলে কোনো প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে তাঁরা সেটি প্রকাশ করেন। লোকমান্য টিলক গীতার ভাষ্য লিখে সপ্রমাণ করলেন, কর্মযোগই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ এবং এদেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়নই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম ; মহাত্মা গান্ধী তাঁর গীতাভাষ্য দিয়েই প্রমাণ করতে চাইলেন যে অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতাপাঠ লিখে প্রমাণ করতে চাইলেন যে জ্ঞানযোগের দ্বারা চিত্তসংযম আত্মজয় করতে পারলেই স্বাধীনতালাভ অনিবার্য। মৌলানা আজাদ তাঁর কুরান ভাষ্য দিয়ে বিশ্ব মুসলিমকে মুক্ত করতে চাইলেন তার যুগ-যুগ সঞ্চিত অন্ধসংস্কার এবং ক্রিয়া-কাণ্ডের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে অতি কৌশলে তিনি তাকে তার কর্তব্য কোন দিকে সেইটে সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন।

এ ভাষ্য তিনি অনায়াসেই আরবীতে লিখতে পারতেন, এবং আরবী ভাষার মাধ্যমে তিনি পাঠকসংখ্যা পেতেন উর্দুর তুলনায় অনেক, অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ, কুরান আরবী ভাষায় লেখা, এবং তাবৎ বিশ্ব মুসলিম আরবীতেই তার ভাষ্য লিখে আসছে (গীতার ভাষ্য যে রকম এক শতাব্দী পূর্বেও সংস্কৃতেই রচিত হয়েছে)। তৃতীয়তঃ, মুসলিম জাহানের কেন্দ্রভূমি মক্কার ভাষা আরবী। চতুর্থতঃ, সে ভূমি আজাদের জন্মস্থলে—আপন জন্মস্থলে যশ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না কোন্ পণ্ডিত?

এ সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে মৌলানা তাঁর তফ্সীর (ভাষ্য) লিখলেন উর্দুতে। মক্কাতে জন্ম নিয়েছিল তাঁর দেহ, কিন্তু তাঁর চৈতন্য এবং হৃদয় গ্রহণ করেছিল তাঁর পিতৃ-পিতামহের ভূমি ভারতকে স্বদেশরূপে। তাই তিনি স্বদেশবাসীর জন্য তাঁর ভাষ্য লিখলেন উর্দুতে (টিলকও ইচ্ছা করলে তাঁর ভাষ্য সংস্কৃতে লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখেছিলেন মারাঠীতে)। পরবর্তী যুগে আজাদ-ভাষ্য আরবীতে অনূদিত হয়, এবং তখন আরবভূমিতে সে ভাষ্যের যে জয়ধ্বনি উঠেছিল তা শুনে ভারতীয় মাত্রই না কী গর্ব, কী শ্লাঘা অনুভব করেছিল। পাকিস্তানীরাও এই পুস্তক নিয়ে গর্ব অনুভব করেন। তাঁরা পাকিস্তান যাবার সময় তাজমহল ফেলে যাওয়ার মত কিন্তু এ ভাষ্য ফেলে ভারতে যাননি। ১৯৪৭-এর পরও আজাদ ভাষ্য লাহোর শহরে লক্ষাধিক সংখ্যক ছাপা এবং বিক্রি হয়েছে।

পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য সচরাচর একসঙ্গে দেখা যায় না। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মুগ্ধ হয়েছি মৌলানার সাহিত্যে রসবোধে, সাহিত্যসৃষ্টি দেখে। মৌলানার সঙ্গে লোকমান্য টিলকের বহু সাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু টিলকের চরিত্রে ছিল দাঢ্য, মৌলানার চরিত্রে ছিল মাধুর্য। টিলককে যদি বলা হয় কট্টর কঠিন শৈব, তবে মৌলানাকে বলতে হয় মরমিয়া মধুর বৈষ্ণব। কারণ মৌলানা ছিলেন স্ফী অর্থাৎ ভক্ত, রহস্যবাদী (মিস্টিক্)। তাঁর সাহিত্যের উৎস ছিল মাধুর্যে, এবং কে না জানে মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ রস।

তাই তাঁর চেহারায় ছিল লাবণ্য, কুরান-ভাষ্যের মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকে মাধুর্য, এবং তাঁর বক্তৃতায় অদ্ভুত অবর্ণনীয় সরলতার সৌন্দর্য।

কিন্তু তাঁর সে সরল সৌন্দর্যবোধ তার পরম প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রম্য রচনাতে। উর্দুতে এরকম রচনা তো নেইই, বিশ্বসাহিত্যে এরকম সহৃদয় রসে ভরপুর লেখা খুঁজে পাইনে। তার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া বর্তমান অক্ষম লেখকের সাধ্যাতীত।

তবে এই শোকের দিনে একটি সান্ত্বনার বাণী জানাই। সাহিত্য আকাদেমি এ পুস্তকের বাঙলা অনুবাদকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে একটি সাবধান বাণীও শুনিয়ে রাখি। সে অনুবাদে বাঙালী পাবে কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকটা। পাবে মূলের অসম্পূর্ণ পরিচয়, এবং হয়তো পাবে অসম্পূর্ণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাই যদি হয়, তবে হয়তো কোনো কোনো বাঙালীর অনাদৃত উর্দুভাষা শেখার ইচ্ছাও হতে পারে। আমাদের সে প্রচেষ্টা হয়তো শোকদুঃখের অতীত অমর্ত্যলোকে মৌলানা আবুল কালাম মহীউদ্দীন আহ্‌মদ অল্‌-আজাদকে আনন্দ দান করবে॥

১৯৫৯।

নস্‌রুদ্দীন খোজা (হোকা)

ইস্তাম্বুল থেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ, রসিক এবং মূর্খ চূড়ামণি নস্‌রুদ্দীন খোজার সপ্তশতম জন্মদিবস মহা-আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

ইংরিজি বর্ণমালার কল্যাণে 'খোজা' কিন্তু বাঙলায় 'হোকা' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অধুনা তুর্কী ভাষা ইংরিজি (লাতিন) হরফে লেখা হয় বলে তার রূপ hoca; কিন্তু তুর্করা 'এচ' অক্ষরের নীচে একটি অর্ধচন্দ্র বা উল্টো প্রথম বন্ধনী দেয় এবং তার উচ্চারণ অনেকটা স্কচ 'লখ্‌ জর্মন 'বাখ্‌' বা ফার্সী 'খবরের' মত,—কিন্তু 'হ্‌' ভাগটা বেশী এবং 'সি' অক্ষরের উপরে একটি হুক্‌ দেয়—এবং তার উচ্চারণ হয় পরিষ্কার 'জ'। ঠিক সেই রকম বাঙলা শব্দ (আসলে আরবী) 'খারিজ' তুর্কী ভাষায় haric লেখা হয়,—অবশ্য 'হ্‌'-এর নিচে পূর্বোল্লিখিত অর্ধচন্দ্র এবং 'সি'-র উপরে হুক্‌ দেয়। 'পররাষ্ট্রনীতি' তাই তুর্কীতে 'সিয়াসত খারিজ।'

রয়টারের টেলিগ্রামে এই অর্ধচন্দ্র ও হুক্‌ বাদ পড়াতে 'খোজা' 'হোকা' হয়ে গিয়েছেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের 'খাজা' ও আগা খানের 'খোজা' (সম্মানিত) সম্প্রদায়ের নামেও একই শব্দ—এটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়।

এই ধ্বনি পরিবর্তনে আমাদের রাগত হওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাঁকড়ের নাম যখন আমরা হামেশাই 'মনকদ', 'মানকদ' অনেক কিছুই লিখে থাকি, এবং ফড়্‌কর-কে 'ফাদকার', 'ফদকর' লিখি, এমনকি এই কলকাতা শহরেই গোখলে-কে 'গোখেল' লিখি এবং উচ্চারণ করি, তখন রসিকবর খোজা যে হোকা হয়ে আমাদের ধোঁকা দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

খোজার জন্মদিন যে-বাইশ তারিখে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল সেইদিনই ইস্তাম্বুল থেকে রয়টার আরেকটি তার পাঠিয়েছেন; তাতে খবর এসেছে যে ঐ দিন পাঁচ শ' বছর পরে তুর্কীতে এক সুপ্ত অগ্নিগিরি জেগে উঠে হা হা করে হেসে উঠেছে।[১]

১। VOLCANIC ERUPTION AFTER FIVE CENTURIES

Istanbul, July 22—Mount Soutlubiyan, in the Kars Province

তা হলে বোঝা গেল মা ধরণীর পাকা দু'শ বছর লেগেছে খোজার রসিকতার মর্ম গ্রহণ করতে ; তাই বোধ হয় হাসতে হাসতে তাঁর নাড়িভুঁড়ি এখন ভূগর্ভ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়েছে !

এদেশে আরবী এবং ফার্সীর চর্চা একদা প্রচুর হয়েছিল। আকবর বাদশাহের আমলে ইরানের এমনই দুরবস্থা যে সেখানকার পনেরো আনা কবি দিল্লী ধাওয়া করেছিলেন। আকবরের সভাকবি আব্দুর রহিম খানখানা নিজেই গণ্ডা গণ্ডা ইরানী কবি পুষেছিলেন, আর স্বয়ং আকবর যে কবি 'আমি' 'তুমি' মিল দিয়ে 'কবিতা' রচনা করতো তাঁকে পর্যন্ত নিরাশ করতে চাইতেন না।

ভারতবর্ষের ফার্সী নাম হিন্দ বা হিন্দুস্থান। 'হিন্দ' শব্দের অর্থ কালো। তাই এক কবি তাঁর দৈন্যের কালরাত্রি ইরানে ফেলে পূর্বাচল ভারতবর্ষ রওয়ানা হওয়ার সময় লিখলেন,

দুর্ভাবনার কালিমা ত্যজিয়া
চলিনু হিন্দুস্থান,
কালোর দেশেতে কালো আমি কেন
করিতে যাইব দান ?

তাই এক ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক হরানের ঐ যুগকে শব্দার্থে 'ইণ্ডিয়ান সামার' বলেছেন। কারণ এর পরই ইরানী সাহিত্যের পতন আরম্ভ হয়।

তুর্কী-ভাষার কিছুটা চর্চাও এদেশে হয়েছিল, কারণ বাবুর, হুমায়ুন এঁদের সকলেরই মাতৃভাষা তুর্কী। শেষ মোগল বাদশা সালামৎ বাহাদুর শাহের হারেমেও কথাবার্তা তুর্কী ভাষাতেই হত এবং তুর্কী সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও অন্যতম অত্যুৎকৃষ্ট কেতাব বাবুর বাদশার আত্মজীবনী। কিন্তু এ-তুর্কী ভাষা মুস্তফা কামালের টার্কির ওসমানলী তুর্কী নয়, বাবুরের ভাষা চুগতাই (বা জগতাই) তুর্কী। কোরমা, দোলমা এবং লড়াই-হাতিয়ারের কিছু শব্দ চুগতাই তুর্কী থেকে বাঙলাতে এসেছে। ওদিকে মোগল দরবার ফার্সীকেই প্রাধান্য

---

of Turkey, has burst into what is believed to be Turkey's first volcanic eruption since the 15th century. A spokesman at the office of the Governor of Kars said the eruption of rock and smoke had caused anxiety and excitement among people living nearby, but there has been no serious damage yet.

দিয়েছিলেন বলে তাঁদের তুর্কী এদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেনি—যদিও প্রাচীন বাঙলাতে 'তুর্ক' বলতে মুসলমান বোঝাতো এবং তামিল ভাষাতে মুসলমান বোঝাতে হলে এখনও 'তুরষ্কম্' শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাঙালী বেকার এখনো চাকরির সন্ধানে 'তুর্কী নাচন' নাচে।

আমরা ইংরিজী ফরাসী পড়ি, রাশান কথাসাহিত্যও আমাদের অজানা নয়, স্পেন পর্তুগাল দেনমার্কের লোক এদেশে এসেছিল এবং আরো অনেকেই,—কিন্তু আশ্চর্য, ওসমানলি তুর্কী ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। আমার জানামতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পাবনা জেলার কবি ইসমাঈল হুসেন শিরাজী (নজরুল ইসলাম এঁর কাছে একাধিক বিষয়ে ঋণী বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন) তুর্কীকে সাহায্য করার জন্য একটি মেডিকেল মিশন নিয়ে সেদেশে গিয়েছিলেন এবং তুর্কী রাজনীতি, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাঙলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তুর্কীর সভাকবি হামিদ পাশার সঙ্গে সে সময়ে তাঁর হৃদ্যতা হয়, কিন্তু তুর্কী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার পরিচয় করিয়ে দেবার পূর্বেই ইংরেজের চাপে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।[১]

তুর্কীর বাইরে ইরান, আফগানিস্থান, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, তথা গ্রীস, বুলগারিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি দেশে নসরুদ্দীন খোজা সুপরিচিত। ইরানের স্বর্ণযুগের একাধিক সুরসিক কবির উপর তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। বল্কানের বাইরে ইয়োরোপে তিনি জর্মনিতে সবচেয়ে বেশী ভক্ত পাঠক পেয়েছেন। ইংরিজী এনসাইক্লোপীডিয়াতে তাঁর নাম নেই, জর্মন সাইক্লোপীডিয়া আকারে

১। 'সুপ্রভাত' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রকে (ইনি 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের বড় মেয়ে) শিরাজী একটি কবিতা ও ছবি পাঠালে পর তিনি (কুমুদিনী) লেখেন, "আপনার কবিতা ও ছবি পাইয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। আপনার কবিতাটি 'সুপ্রভাতে' প্রকাশিত হইবে। তুরস্কের-নারীদিগের অতীত ও বর্তমান অবস্থা স্বদেশের কার্যে ও উন্নতিতে তাহাদের সাহায্যদান, তাহাদের শিক্ষা ও স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা শীঘ্রই অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল যুবক আহতদিগের সেবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্যের বিবরণ লিখিবেন।"

—বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৫৭।

ইংরিজীর অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সেটাতে তাঁর সম্বন্ধে কয়েক ছত্র আছে। আর একাধিক অনুবাদ জর্মন ভাষাতে তো আছেই। অবশ্য আজকের দিনের রুচি দিয়ে বিচার করলে তাঁর বহু কুট্টনীরসাশ্রিত জিনিস শুধু লাতিনেই অনুবাদ করা যায়।

খোজার জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবন ও তাঁর হরেক রকমের রসিকতা এমনই জড়িয়ে গিয়েছে যে তার জট ছাড়ানো অসম্ভব। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত দু' আনা পরিমাণ কিংবদন্তী বিশ্বাস করলে আমাদের কালিদাস সম্বন্ধে প্রচলিত সব ক'টাই বিশ্বাস করতে হয়। এমন কি তিনি পাঁচ শ' না সাত শ' বছর আগে জন্মেছিলেন সেই সমস্যারই চূড়ান্ত সমাধান এযাবৎ হয়নি। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খোর্তো গ্রামে তাঁর জন্ম, সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, এবং আকৃশেহিরে তাঁর মকবরহ্ বা সমাধিসৌধ দেখানো হয়। ইনি যে সুপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকলে 'ইমাম' (ইংরিজিতে অন্ততপক্ষে বিশপ) হওয়া যায় না। অন্যান্য একাধিক ব্যাপারেও তিনি সমাজের অগ্রণীরূপে তুর্কী এবং তুর্কীর বাইরে সুপরিচিত ছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁর নামে প্রচলিত গল্পের ক'টি তাঁর নিজস্ব ও ক'টি উদোর শিরনি বুধোর দর্গায়, সে-বিচার অসম্ভব। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণ হার মেনে বিক্রমাদিত্যের নামে প্রচলিত গল্প যে 'বিক্রমাদিত্য সাইকল্', খৈয়ামের নামে চলিত-অচলিত চতুষ্পদী 'খৈয়াম চক্র' নামে অভিহিত করেছেন ঠিক সেইরকম এখন খোজার নামে লিখিত, পঠিত, শ্রুত গল্পকে 'খোজা চক্র' নাম দিয়ে দায়মুক্ত হন। কিন্তু গল্পগুলো বিশ্লেষণ করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তার অনেকগুলোই আরবভূমি, প্রাচীন ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে। সিরিয়া এবং প্রাচীন বল্কানেও এর অনেকগুলো প্রচলিত ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সে-সব বাদ দিলেও খোজার তহবিলে প্রচুর হাস্যরসের উপাদান উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এবং তার চেয়েও বড় কথা— সুখে-দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে, মসজিদে-সরাইয়ে, বাজারে-বৈঠকখানায় খোজা যে ভাবে তাঁর গল্পে, আচরণে ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজকে প্রকাশ করেছেন তারই একটি অতি সুস্পষ্ট হাস্যময়, সদানন্দ, দরদী ছবি তুর্কীদের বুকের ভিতর আঁকা। আজ যদি বেহশ্‌ৎ থেকে ফিরিশ্‌তা (দেবদূত) ইস্তাম্বুলে নেমে

বিশ্বজনের কাছে সপ্রমাণ করে যান যে ইমাম নসরুদ্দীন খোজা নামক কোনো ব্যক্তি এ ধরায় জন্মগ্রহণ করেননি তবুও তুর্কীর লোক অচঞ্চল চিত্তে সেই তসবীরই ধারণ করবে, বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েক লহমার ভিতরেই খোজার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে এবং যদি সেখানে একাধিক তুর্ক উপস্থিত থাকে, এবং আপনি যে খোজাকে চেনেন না সে-কথা বুঝতে পারে, তবে আপসে পাল্লা লেগে যাবে কে কত বেশী খোজার গল্প বলতে পারে। এদেশে যেমন বিস্তর রবীন্দ্র-ভক্ত আছেন যাঁরা প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপরসগন্ধস্পর্শ বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো গান, বা একাধিক গান দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, ঠিক তেমনি জীবনের সুখ দুঃখ, বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা, লটারি লাভ—সব কিছুই খোজার কোনো গল্প দিয়ে রসরূপে প্রকাশ করা যায়। কারণ খোজা শুধু এলোপাতাড়ি রস সৃষ্টি করে যাননি—তার মারফতে খোজার পরিপূর্ণ জীবনদর্শন বা 'ভেল্টআনশাউঙ' পাওয়া যায়।

খোজার গল্প তিন রকমের। সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি যেখানে চালাকী করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছেন, কিম্বা মারাত্মক উত্তর দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করছেন তার সংখ্যাই বেশী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এন্তের গল্প আছে যেখানে তিনি একটি পয়লা নম্বরের ইডিয়েট, গাড়সস্য কুৎব্ মিনার। এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে বোঝা যায় না, তিনি বোকা না আমরা বোকা।

যেমন মনে করুন, খোজাকে অমাবস্যার রাতে শুধানো হল পূর্ণিমার চাঁদ গেল কোথায়? খোজা এক গাল হেসে উত্তর দিলেন, 'তাও জানো না, পূর্ণিমার চাঁদকে প্রতি রাত্রে ফালি ফালি করে কেটে নেওয়ার পর এখন সেগুলো গুঁড়ো করে আকাশের তারা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

খোজা বোকা বনতে চান, না বানাতে চান?

অবশ্য খোজার গীতিরস বা লিরিকরস অসাধারণ ছিল। এই কবিত্বময় ব্যাখ্যাটি দিয়ে তিনি যে গীতিরস সৃষ্টি করতে চাননি, বা যে-সব কবি অসম্ভব অসম্ভব তুলনা দিয়ে কাব্যরস সৃষ্টি করতে চান তাদের নিয়ে মস্করা করতে চাননি এ-কথা বলা কঠিন। কারণ আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রেও আছে—

'প্রিয়ে, আকাশে চন্দ্রের মুখ দেখে
মনে হল তোমার মুখ,
তাই আমি চাঁদের পিছনে পিছনে ছুটছি।'

এ ধরনের তুলনাকে 'অসম্ভব তুলনা' বলে আলঙ্কারিক দণ্ডিন্ কাব্যাদর্শে নিন্দা

করেছেন। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে এতে হাস্যরসের অবতারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা লোক যদি চাঁদের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ খোয়াই-ভাঙা মাঠ-ময়দান ভেঙে ছুটতে আরম্ভ করে আর বলতে থাকে, 'ঐ আমার প্রিয়া', 'ঐ আমার প্রিয়া', তাহলে পাড়ার ডন্ জোয়ানদেরও হেসে ওঠা অসম্ভব নয়।

তবু না হয় মেনে নেওয়া গেল, চাঁদকে গুঁড়ো করে খোজা ইচ্ছা করেই বোকা বনেছেন। কিন্তু এখন যেটা বলছি সেটাতে খোজা কি?

দোস্তের বাড়ির দাওয়াতে খোজা খেলেন এক নতুন ধরনের মিশরী কাবাব। অতি সযত্নে এক টুকরো কাগজে লিখে নিলেন তার রেসিপি কিংবা পাকপ্রণালী কিংবা যাই বলুন। ততোধিক সযত্নে, ব-তরীবৎ সেটি রাখলেন জোব্বার ভিতরে গালাবিয়ার বুকপকেটে। রাস্তায় বেরিয়েই গেলেন তাঁর প্যারা কসাইয়ের দোকানে। আজ সন্ধ্যায়ই গিন্নীকে শিখিয়ে দেবেন কি করে এই অমূল্যনিধি রাঁধতে হয়। আর খাবেনও পেট ভরে। বন্ধুর বাড়িতে মেকদারটা একটু কম পড়েছিল। গোশ্‌ৎ কিনে খোজা রাস্তায় নামলেন।

হঠাৎ চিল এসে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে হাওয়া।

খোজা চিলের পিছনে ছুটতে ছুটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে চিলকে বলতে লাগলেন, 'আরে কোরছ কি? শুধু মাংসটা নিয়ে তোমার হবে কি? রেসিপিটা যে আমার পকেটে রয়ে গেছে। কী উৎপাত! দাঁড়াও না।'

কিন্তু এভাবে গল্পের পর গল্প বলতে থাকলে খোজার সম্পূর্ণ গ্রন্থ নকল করে দিতে হয়। সম্পাদক আপত্তি জানাবেন।

এবারে তাহলে যে ধরনের গল্পের জন্য খোজা সুপ্রসিদ্ধ তারই একটি নিবেদন করি।

কথিত আছে, একদা খোজা জন্মভূমি তুর্কীর প্রতি বিরক্ত হয়ে দেশত্যাগ করে ইরান দেশে চলে যান। এতে আশ্চর্য হবার মত কিছুই নেই। কারণ খোজা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন পরোপকারী—আমাদের বিদ্যাসাগরের মত দাগা খাওয়া বিচিত্র নয়।

তা সে যাই হোক,—লোকমুখে ইরানের রাজা সে খুশ-খবর শুনে বে-এক্তেয়ার। তড়িঘড়ি লোকলশ্‌করসহ উজীর-ই-আলাকে পাঠিয়ে দিলেন খোজাকে পরম যত্ন সহকারে রাজদরবারে নিয়ে আসতে। খোজা আসামাত্র তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান ত্যাগ করে বাদশা তাঁকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন।

মাথায় সোনার তাজ পরিয়ে দিলেন, গায়ে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে দিলেন, কোমর-বন্ধে দমশ্‌কী তলওয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে জয়জয়কার।

সভাভঙ্গের পর বাদশা নিভৃতে ইতি-উতি করে, আশ-কথা পাশ-কথা কাড়ার পর অতি সন্তর্পণে তাঁর জাগীরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। খোজা করজোড়ে 'সে কি শাহ্-ইন-শাহ, আপনার যে পূত পবিত্র…ইত্যাদি' বলে তিনি নিবেদন করলেন, রাজসম্মানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।[১]

বাদশাহ বিস্তর চাপাচাপি করার পর খোজা বললেন, 'হুজুরের যখন নিতান্তই এ হেন বাসনা তবে হুকুম জারি করে দিন কাল সকাল থেকে যারা বউকে ডরায় তারা আমাকে একটি করে ডিম প্রতি সকালে দেবে।'

দীন দুনিয়ার মালিক বাদশা তো তাজ্জব। 'ওতে আপনার কি হবে? আমি খবর পেয়েছি, আপনি দান-খয়রাতে দাতাকর্ণ।'

খোজা এলবুর্জ পাহাড়ের মত অচল অটল। তবে তাই সই। ইরানী ভাষায় বলতে গেলে আলোচনার কার্পেট তখন রোল্ করে গুটিয়ে ঘরের কোণে খাড়া করে রেখে দেওয়া হল।

পরদিন ফজরের নমাজের সময় থেকেই হৈ-হৈ রৈ-রৈ। এস্তেক রাজবাড়িতেও মমলেট্-অমলেট নেই। কি ব্যাপার? যাদের বাড়িতে মুর্গী নেই তারা ফজরের আজানের পূর্বে ছুটেছে বাজার পানে। ডিম কিনে ধাওয়া করেছে খোজার ডেরার দিকে।

সেখানে ডাঁই ডাঁই হুদো হুদো আণ্ডার ছয়লাপ! আণ্ডার নবীন ব্রহ্মাণ্ড!

পাইকিরী ব্যবসায়ীরা চতুর্দিকে বসে!

সাতদিন যেতে না যেতে খোজা ঢাউস তেতলা হাওয়া-মঞ্জিল হাঁকালেন। পক্ষাধিককাল মধ্যেই বোখারার কার্পেট, সমরকন্দের রেশমী তাকিয়া, মুরাদাবাদী আতরদান, গোলাবপাশ, বিদরী আলবোলা, রাজস্থানের গোলাপী মার্বেলের ফোয়ারা, সরণ দীপের (স্বর্ণদ্বীপ সিংহল) হাতির দাঁতের চামর, ব্যজনী!

বাদশা তো আজব তাজ্জব মানলেন।

কুলোকে বলে দু'একজন অমিতবীর্য অসীমসাহসী শের-দিল রুস্তম নাকি ডিম নিয়ে যায়নি দেখে তাদের (অথবা তার) স্ত্রী নাকি শুধিয়েছিল, 'ওঃ! তুমি বুঝি আমাকে ডরাও না?' তারপর আর দেখতে হয় নি!

১। ইরানে বাদশার সামনে কোন্ মন্ত্র দিয়ে নিবেদন আরম্ভ করতে হয়, তার পুরো বিবরণের জন্য 'দেশে-বিদেশে' বিংশতি অধ্যায় পশ্য।

ইরানের বাদশা খুশীতে তুর্কীর খাস খলীফাকে ছাড়িয়ে গেছেন।

এমন সময় রাজার মস্তকে বজ্রাঘাত। খোজা তিন মাসের ছুটি চান,—দেশ থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবেন বলে। খোজা মারাত্মক একদারনিষ্ঠ। রাজা আর কি করেন, অতি অনিচ্ছায় ছুটি দিলেন, অবশ্য, তিন মাস রিট্রেঞ্চ করে দু'মাসের তরে। যাবার সময় বললেন, 'দোস্ত! দেরী করবেন না আপনার বিরহে আমার—' বাদশার গলা জড়িয়ে এল। ততদিনে তাঁদের সম্পর্ক আর রাজা-প্রজার নয়—দোস্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুমাসের কয়েকদিন পূর্বেই খোজা রাজসভায় পুনরায় উপস্থিত। রাজা পরমানন্দে রাজোচিত ভাষায় শুধালেন, 'তবে কি পুণ্যশ্লোকা বেগম-সাহেবা স্ব-ভবনে অবতীর্ণা হয়েছেন?'

খোজা বললেন, 'হ্যাঁ হুজুর! তবে কি না, ভবনটি তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেই হ'ত আরো ভালো।'

তদ্দণ্ডেই সভাভঙ্গের হুকুম হল। বাদশা নিয়ে গেলেন খোজাকে অন্দরমহলে।

'শতেক বছর পরে বঁধুয়া আসিল ঘরে—'

বাদশার তখন ঐ হাল। দোস্তের সঙ্গে নিভৃতে দুহুঁ দুহুঁ হয়ে কুহু কুহু করবেন।

দু-পাত্র শিরাজী খেয়ে বাদশা খোজার কাছে ঘেঁষে বললেন, 'দোস্ত্! রাজ্যের আর সকলের সঙ্গে আমার রাজা-প্রজার সম্বন্ধ। তারা আমার কাছ থেকে চায়, আমি তাদের দি। কিন্তু আপনি আমার দোস্ত—আপনার সঙ্গে দোস্তীর সম্পর্ক। দোস্ত যখন দেশে ফেরে তখন দোস্তের জন্য—' বাদশা গলা সাফ করে বললেন, 'এই, ইয়ে, মানে, কোনো কিছু একটা সওগাত আনে। আপনি তো আনেন নি।'

বলে বাদশা খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিশ্রী রকমের হাসতে লাগলেন।

না-হক্ক বেইজ্জৎ হলে মানুষ যে রকম বেদনাতুর কণ্ঠে ককিয়ে ওঠে, খোজা সেইরকম বললেন, 'জহাঁপানা কুল্লে দুনিয়ার ইমান-ইনসাফের মালিক, এ সংসারে আল্লা-তালার ছায়া (জিল্লুল্লা)—আমার উপর অবিচার করবেন না। এনেছি, আলবৎ এনেছি। দেশে পৌঁছে সকলের পয়লা হুজুরেরই সওগাত সংগ্রহ করেছি। আজ সঙ্গে আনি নি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় নিয়ে আসবো।'

একেই বলে দোস্ত্!

উদ্‌গ্রীব হয়ে রাজা শুধালেন, 'কি? কি? আমার যে তর সইছে না। আঃ, জীবনে এই প্রথম কিছু-একটা পেলুম।'

খোজা বললেন, 'নিজের আনা সওগাতের প্রশংসা করতে বাধছে কিন্তু সত্যি হুজুর—অপূর্ব, অতুলনীয়। একটি অপরূপ সুন্দরী তুর্কী তরুণী আপনার জন্যে এনেছি হুজুর।'[১]

তারপর খোজা উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই তরুণীর রূপ বর্ণনা আরম্ভ করলেন, একেবারে

---

(১) ইরানে তুর্কী রমণীর বড়ই কদর।

'হে তরুণী হে তুরস্কী, হে সুন্দরী সাকি
এমনি হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি,
তব কপোলের ঐকৃষ্ণ তিল লাগি
বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।'

অনুবাদটি ভালো নয়। কিন্তু হাফিজের এই কবিতাটি এতই বিখ্যাত যে, তার একাধিক ইংরিজি অনুবাদ আছে,—

"If that unkindly Shirazi Turk
would take my heart in her hand
"I'd give Bukhara for the mole upon
her cheek, and Samarkand."

কিম্বা

"Sweet maid, if thou wouldst charm my sight;
And bid these arms thy neck infold;
That rosy cheek, that lily hand
Would give thy poet more delight
Than all Bokharas vaunted gold.
Than all the gems of Samarkand."

ঝঙ্কারের জন্য ফার্সীটা শুনন:

'অগর্ আন্ তুর্ক-ই-শিরাজী
বদস্ত্ আরদ্ দিল-ই মারা
ব-খাল-ই হিন্দো ওশ বখ্‌শম্
সমর্‌কন্দ্ ওয়া বুখারারা।'

কথিত আছে এ দোহা লিখে হাফিজকে তিমুরলেনের সামনে বিপদে পড়তে হয়েছিল। সেটা বারান্তরে হবে।

আমাদের বিদ্যাপতি স্টাইলে, নখ্ থেকে শির পর্যন্ত—যাকে বলে নখ-শির বর্ণন। 'ওহো হো হো,—একটি তন্বঙ্গী চিনার গাছ হেন। কী দোলন, কী চলন!'

বাদশা বললেন, 'আস্তে।'

কিন্তু খোজাকে তখন পায় কে, তিনি মৌজে। গলা চড়িয়ে বললেন, 'চিকুর কেশ তো নয়, যেন অমা যামিনীর স্বপ্নজাল—আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মৃগনাভি সম।'

উৎসাহের তোড়ে খোজা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। যেন রাজকবি দরবারের সবাইকে শুনিয়ে কবিতা পাঠ করছেন।

বাদশা ব্যাকুল হয়ে খোজার জোব্বা টেনে কাতরকণ্ঠে বললেন, 'চুপ্, চুপ্ আস্তে আস্তে—পাশের ঘরে বেগম-সায়েবা রয়েছেন।'

ঝুপ করে বসে পড়ে খোজা বিনয়নম্র কণ্ঠে বললেন, 'হুজুর, কাল সকাল থেকে একটি করে আণ্ডা পাঠিয়ে দেবেন। আমার পাওনা।'

এইখানেই খোজা-কাহিনী শেষ করলে ঠিক হত। কিন্তু তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি পরলোকগমনের পূর্বে যে শেষ রসিকতাটি করে গিয়েছেন, সেটি বাদ পড়ে যায়। কারণ সেটি আজও প্রথম দিনের মত তাজা, অতিশয় নব—ফার্সীতে যাকে বলে 'তাজা-ব্-তাজা, নৌ-ব নৌ'[১]। দ্বিতীয়ত, আণ্ডার গল্পটি আমি শুনেছি আমার সর্ব-কনিষ্ঠা ভগিনী লুৎফুন্নিসার কাছ থেকে। আমার মত তার পায়েও চক্কর আছে। সে শুনেছে, লাহোর না পেশাওয়ার কোথায় যেন। এর থেকে এটাও বোঝা যায়, খোজার গল্প মুখে মুখে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বাঙলা দেশেও পৌঁছল। সপ্তদশ অশ্বারোহী গাঁজা; দশ বাদ দিয়ে সপ্ত শতাব্দীতেই হয়।

এবারে শেষ গল্প। এটাতে আপনি আমি সবাই আছি।

যেমন মনে করুন, দৈবযোগে আপনি পৌঁচেছেন আক্‌শেহিরে। স্বভাবতই আপনার মনে বাসনা, দিলে ইরাদা জাগবে খোজার গোরস্তান দেখবার জন্য। একাই বেরিয়ে পড়ুন; কিচ্ছুটি ভাবনা নেই, সবাই রাস্তা চেনে।

সেখানে গিয়ে দেখবেন, সামনে এক বিরাট দেউড়ি—প্রবেশদ্বার। কোথায় লাগে তার কাছে ফতেহ্-পুর-সিক্রিতে আকবর বাদশার বুলন্দ্-দর্‌ওয়াজ্। একেবারে শিশু। তা না হয় হ'ল কিন্তু অবাক হবেন দেখে যে বন্ধ দরজায় এক বিরাট তিন মণ ওজনের তালা!

১। সত্যেন দত্তের অনুবাদ আছে।

গোরস্থানে আছেই বা কি, যাবেই বা কি? এই ভারতবর্ষেই লুটতরাজের ফলে যা কিছু ইমারৎ বেঁচে আছে, সেগুলো হয় কবর নয় মসজিদ—ওসবে লুটের কিছু নেই বলে। তিনমণী তালা দিয়ে খোজার দেহরক্ষা--অন্যার্থে—করা হচ্ছে, মিশরী মমীর মত? কিন্তু ইসলামে তো হেন ব্যবস্থা নেই।

নাচার হয়ে তালাটা বন্ধ দোরে বার কয়েক ঠুকলেন, এদিক ওদিক গলা বাড়িয়ে চেল্লাচেল্লি করলেন।

তখন দরাজ-দেউড়ির একপাশ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল পাহারাওলা। আপনাকে সবিনয় নিবেদন করবে,

'কি হবে ঐ বিরাট তালা খুলে। ওটা কখনো খোলা হয়নি। চলুন পাঁচিল ডিঙিয়ে যাই।'

মানে?

একশ' ফুট উঁচু দেউড়ি—চতুর্দিকের পাঁচিল উঁচুতে এক ফুট হয় কি না হয়!

মানে?

খোজার আখেরী শেষ মস্করা। উইলে এইভাবে তৈরী করবার আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে চেয়েছিলেন, 'এ জীবনে আমরা সামনের দিকটা আগলাতেই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে আর সব দিক দিয়ে যে বেবাক কিছু চলে যায়, তার খবর রাখিনে।

* * * *

আমি আকৃশেহির যাইনি। কাজেই হলপ খেয়ে বলতে পারবো না, খোজার দর্গা এই পদ্ধতিতে নির্মিত কি না। যদি না হয় তবে বুঝবো খোজা আরো মোক্ষম রসিক। বিন খর্চায় আমাদের এখনো হাসাচ্ছেন আর বোকা বানাচ্ছেন॥

১৯৫৯

নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর, হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবী-ফার্সীর চর্চা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ব-বাংলার মত ছড়িতে পড়তে পারেনি, কাজেই অতি সহজেই অনুমান করা যায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর-দরবেশদের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবী-মৌলানারা সেখানে আরবী-ফার্সীর বড় কেন্দ্র স্থাপনা করতে পারেননি।

তদুপরি নজরুল ইসলাম ইস্কুলে সুবোধ বালকের মত যে খুব বেশী আরবী-ফার্সী চর্চা করেছিলেন তাও মনে হয় না। ইস্কুলে তিনি আদৌ ফার্সী (আরবীর সম্ভাবনা নগণ্য) অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানিনে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারবেন।

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি সে সব ভাষায় খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না। পল্টনের হাবিলদার যে জাব্বা-জোব্বা পরে দেওয়ানা-দেওয়ানা ভাব ধরে হাফিজ-সাদীর কাব্য কিম্বা মৌলানা রূমীর মসনবী সামনে নিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াবে তাও তো মনে হয় না। এমন কি রঙীন সদরিয়ার উপর মলমলের বুটিদার অঙ্গরখা পরে হাতে শিরাজার পাত্র নিয়ে সাকীর কণ্ঠে ফার্সী গজল আর কসীদা-গীত শুনছেন, এও খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় না। কসম খেয়ে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা শক্ত, তবে এটা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কাব্যে যদ্যপি 'খাকী' এবং 'সাকী' চমৎকার মিল, তবু বাস্তব জীবনে এদুটোর মিল এবং মিলন সচরাচর হয় না।

তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরের সন্তান। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন, দোয়া-দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্থ করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাঙলা

ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং আমপারার সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি লিরিকের রাজা মেঘদূতখানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ততখানি কি কোনো পণ্ডিত পেরেছেন ? বহু লোকই বাঙলা দেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছে, কিন্তু ঐ মাটির জন্য প্রাণ তো তারা দেয়নি। কানাইলাল, ক্ষুদিরাম ভালো জরিপ জানতেন একথাও তো কখনো শুনিনি।

কাজী রোমান্টিক কবি। বাঙলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যাননি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (শুনেছি, পণ্ডিত হয়েও ম্যাক্সমূলার ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন এবং তাই বহুবার সুযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজী হননি।) কিন্তু ইরানের গুল্-বুল্বুল্, শিরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে এমনই এক জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিল যে, গাইড-বুক টাইমটেবিল ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি করে মাতৃভূমি—একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি প্যারিস। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান। কীটস বায়রনের বেলা যে রকম ইংল্যাণ্ড ও গ্রীস।

আরবভূমির সঙ্গে কাজী সায়েবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের 'হারানো ইউসুফের' যে করুণ কাহিনী বহু মুসলিম অমুসলিমের চোখের জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে।

দুঃখ করো না, হারানো য়ুসুফ
কানানে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥
ইউসুফে গুম্‌গশ্‌তে বা'জ্‌ আয়দ ব্‌কিনান্‌
গম্‌ ম্‌-খূর।
কুল্‌বয়ে ইহ্‌ জান্‌ শওদ্‌ রূজি গুলিস্তান্‌
গম ম্‌-খুর॥

কাজী সায়েবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাঙলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়ে'র অনুকরণে 'শাতিল আরব শাতিল আরব' ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোনো কোনো মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী 'বিদ্রোহী' লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিল (যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে, কাজীর হৃদয়ের গভীরমত অনুভূতি বোধ হয় বাঙলার জন্য নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে—পরবর্তী যুগে কেন, ঐ সময়েই, কবিকে যারা ভালো ক'রে চিনতেন, তাঁরাই জানতেন, ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানী ব'লে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী ব'লে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।

সে বিদ্রোহ কিসের বিরুদ্ধে?

এ স্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন।

ইরানী ও ভারতীয় একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। দুই জাতির ইতিহাসেই অনেকখানি মিল দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইরানীরা যে রকম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে একদিকে মিশর প্যালেস্টাইন, অন্য দিকে গ্রীস পর্যন্ত হানা দিয়েছিল, ভারতীয়েরা সে রকম করেনি। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী অভিযানের ফলে ইরানভূমি যে রকম একাধিকবার সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়েছে, ভারতবর্ষের ভাগ্যে তা কখনো ঘটেনি। এ সব কারণেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক ইরানীরা সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই সে এক উগ্র স্বাজাত্যাভিমানের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ যেখানে

শান্তভাবে বিদেশীর ভালো-মন্দ দেখে চিনে নিজকে মেলাবার, পরকে আপন করার চেষ্টা করেছে, ইরান সেখানে আদৌ সে-চেষ্টা করেনি, এবং শেষটায় যখন বাধ্য হয়ে সব-কিছু নিতে হয়েছে তখন করেছে পরবর্তীকালে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

গ্রীস-রোমের কাছে পরাজিত হওয়া এক কথা, আর প্রতিবেশী 'অনুন্নত', 'অর্ধসভ্য' আরবদের কাছে পরাজিত হওয়া আরেক কথা। তদুপরি গ্রীক রোমানরা ইরানে যে সভ্যতা এনেছিল, তাতে গরীব দুঃখীর জন্য নূতন কোনো আশার বাণী ছিল না। যে নবীন ধন-বণ্টন পদ্ধতি দ্বারা হজরৎ মুহম্মদ আরব দেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রন্থন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর বাণী এসে পৌঁছল ইরানে। ফলে মুহম্মদ সাহেবের পরবর্তীগণ যখন একদিন অন্যান্য জাতির মত দিগ্বিজয়ে বেরোল তখন ইরানী শোষক সম্প্রদায় দেখে মর্মাহত ও স্তম্ভিত হ'ল যে, ইরানের জনসাধারণ আরবের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হ'ল না। তারপর আরবরা বিজিত দেশের ধর্মজগতে যে সাম্যবাদ ও অর্থের ক্ষেত্রে যে ধনবণ্টন পদ্ধতি প্রচার করলো, তাতে আকৃষ্ট হয়ে ইরানের জনসাধারণ মুসলমান হয়ে গেল। জ্ঞানাভিমানী ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ও শেষ পর্যন্ত ঐ ধর্ম গ্রহণ করল। তখনকার মত ইরানী সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু বিদ্রোহ লুপ্ত হ'ল না।

সেটা দেখা দিল প্রায় চারশ' বছর পরে ফিরদৌসীর মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা'তে। রাষ্ট্রভাষা আরবীকে উপেক্ষা ক'রে ফিরদৌসী গাইলেন প্রাক্‌-মুসলিম যুগের ইরানী বীরের কাহিনী, রাজার দিগ্বিজয়, প্রেমিকের বিরহ-মিলন গাথা—নবীন অথচ সনাতন সেই ফার্সী ভাষায়। যে ফার্সী কাব্য-সাহিত্য পরবর্তী যুগে বিশ্বজনের বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তার প্রথম সার্থক কবি ফিরদৌসী।

এই নূতন ভাষাতে, নবীন প্রাণে উন্মত্ত হয়ে যে সব কবি কাব্যের সর্ব বিষয়-বস্তু নিয়ে নব নব কাব্যধারায় প্রবর্তন করলেন, তার কাছে পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় রেনেসাঁসও এতখানি সর্বমুখী বলে মনে হয় না। দু'শ বছর যেতে না যেতেই বিশ্বের কাব্যজগতে ইরান তার অদ্বিতীয় আসন সৃষ্টি ক'রে নিল।

এঁদের মধ্যে সত্য বিদ্রোহী কবি ওমর খৈয়াম।

* * * *

ইরানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত তথা পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভিতর বিভিন্ন আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল। তার মধ্যে :

প্রথম, যাঁরা মুসলিম শাস্ত্রের চর্চা ক'রে যশস্বী হলেন। ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, ইরানীরা আরবীর মত কঠিন ভাষা আয়ত্ত ক'রে সে শাস্ত্রে এতখানি ব্যুৎপত্তি অর্জন করলো কি ক'রে? মুসলমানদের মন্থুর নাম ইমাম আবু হানীফা। পৃথিবীর শতকরা আশী জনেরও বেশী মুসলমান আজ নিজকে হানফী অর্থাৎ আবু হানীফার মতবাদে বিশ্বাসকারী ব'লে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার মত কীই বা আছে? শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য তো শুনেছি ভারতবর্ষের দক্ষিণতম কোণের লোক, এবং তাঁর ধমনীতে যে অত্যধিক আর্যরক্ত ছিল তাও তো মনে হয় না,—অন্ততঃ একথা তো অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, আর্য উত্তর ভারতের তুলনায় মালাবারে সংস্কৃত-চর্চা ছিল অনেক কম। তবু যে তিনি শুধু তাঁর মাতৃভূমি মালাবারে বৌদ্ধদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, আর্য উত্তর ভারতেও তিনি তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরানী আবু হানীফার মতবাদও একদা ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদীনা তথা আরব দেশ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এ রকম উদাহরণ পৃথিবীতে আরো আছে।

দ্বিতীয়, যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ড, টীকা-টিপ্পনী, মন্ত্রতন্ত্রে সম্পূর্ণ আস্থা না দিতে পেরে 'রহস্যবাদ' বা সুফীতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসার করতে লাগলেন; এঁরা ভগবানের আরাধনা করেন রসের মাধ্যমে এবং বাঙলার বৈষ্ণব তথা 'মরমিয়াদের' সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যেতে পারে।

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই, সখি, তাদের কথায়
বাহিরে থাকেন তারা।

* * *

ঐ চাহনিতে বিশ্ব মজেছে
পড়িয়াছে কত অশ্রুধার
পাগল করিল এ প্রমত্ত আঁখি
কুলমান রাখা হৈল ভার।

এ ধরনের কবিতা সুফী ও বৈষ্ণবদের ভিতর এতই প্রচলিত যে, কোন্‌টি সুফী কোন্‌টা বৈষ্ণব ধরে ওঠা অসম্ভব। যদি বলি,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
রাধিকার মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

তবে চট ক'রে কেউ আপত্তি করবেন না। অথচ আসলে আছে,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

('সদ্ভাব-শতক', কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অনুবাদ)

বৈষ্ণবদের সঙ্গে এঁদের আরো বহু মিল আছে। এঁদের সুফীবাদ পরবর্তী যুগে তথাকথিত 'তুর্কী'রা গ্রহণ করে। বাঙলা দেশে প্রথম যে মুসলমানরা আসেন তাঁদের আমরা 'তুর্ক' 'তুরুক্' নাম দি (প্রাচীন বাঙলার 'মুসলমান' শব্দের প্রতিশব্দ 'তুর্ক'—তামিলে এখনো 'তুরষ্কম') এবং তাঁদের চক্রাকারে নৃত্য করে আল্লার নাম জপ ('জিক্‌র'—যার থেকে বাঙলা 'জিগির' শব্দ এসেছে) করা দেখে 'তুর্কী-নাচন-নাচা' প্রবাদটি এসেছে। বৈষ্ণবদের মত এঁরাও জপ করতে করতে 'হাল' ('দশা') প্রাপ্ত হন,—অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও মুখ দিয়ে তখন প্রচুর ফেনা বেরয়। পূর্ব ইয়োরোপে এই নাচ দেখে ইয়োরোপীরা এদের নাম দিয়েছিল "ডানসিং দরবেশ"। ইংরিজীতে কথাটা এখনো চালু আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্যধিক বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, কারণ আউল-বাউল, ভাটিয়ালি-মুর্শীদিয়া গীত যাঁরাই শুনেছেন, তাঁরাই এই ফার্সী সুফী ভক্তিবাদের কিঞ্চিৎ গন্ধস্পর্শ পেয়েছেন।

তৃতীয়, দার্শনিক সম্প্রদায়। আর্যগোষ্ঠীর দুই সম্প্রদায়—ভারতীয় ও গ্রীকরাই প্রধানতঃ দর্শনের চর্চা করেছেন।

মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত 'ভারতবর্ষ' পুস্তকের (প্রাচীন তথা অর্ধার্বাচীন ভারতের বহুমুখী কার্যকলাপ, চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান তাঁদের পক্ষে এ পুস্তক অপরিহার্য; বস্তুতঃ বর্তমান লেখক ব্যক্তিগতভাবে এ পুস্তককে মহাভারতের পরেই স্থান দেয়) লেখক পণ্ডিত অল-বীরূনী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'দর্শনের চর্চা করেছেন গ্রীক এবং ভারতীয়েরা—আমরা (অর্থাৎ আরবী-লেখকেরা) যেটুকু দর্শন শিখেছি তা এঁদের কাছ থেকেই।' কথাটা মোটামুটি সত্য, যদিও পণ্ডিতজনসুলভ কিঞ্চিৎ বিনয় প্রকাশ এতে রয়েছে, কারণ আরবরা গ্রীকদর্শনের আরবী অনুবাদ দিয়ে দর্শন-চর্চা আরম্ভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু পরবর্তী যুগে আভিচেন্না (বু আলী সিনা), আভেরস (আবু রুশ্‌দ্) ও গজ্জালী (অল-গাজেল—এঁর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহীতে প্রকাশিত হয়) বহু মৌলিক চিন্তা দ্বারা পৃথিবীর দর্শন ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা ভালো, এঁদের দর্শন শঙ্কর-দর্শনেরই ন্যায় ধর্মাশ্রিত এবং যে-স্থলে কুরানের বাণীর সঙ্গে গ্রীক-দর্শনের দ্বন্দ্ব বেধেছে

সেখানে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে-দ্বন্দ্বের সমাধান করার, এবং সময়ে সময়ে তখন তাঁরা নিও-প্লাতোনিজম অর্থাৎ ভারতের উপনিষদ্‌সম্মত অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করেছেন। এঁদের বিশেষ নাম 'মুতকল্লিমূন' এবং পরবর্তী যুগে এদেশের রাজা রামমোহন তাঁর বিশ্বদর্শন (ভেল্টানশাউউঙ) নির্মাণে এঁদের পরিপূর্ণ সাহায্য নিয়েছেন।

চতুর্থ, ঐতিহাসিক ও কবিগোষ্ঠী। ইতিহাস-চর্চায় আরবদের দক্ষতা সর্বজনমান্য, তবে ইরানীরাও এ-শাস্ত্র তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে এর অনেক উন্নতিসাধন করেন। কিন্তু আমরা যে যুগের আলোচনা করছি তখনো ইরানীদের কাছে ইতিহাস ও পুরাণের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়নি। ফিরদৌসীর 'শাহনামা' (রাজবংশ। কাব্যের রাজা-মহারাজা, নায়ক-নায়িকারা অধিকাংশই কবিজনসুলভ কল্পনাপ্রসূত—অন্তত তাঁদের কীর্তিকলাপ তো বটেই। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়, প্রাক্ ইসলামী এই সব অগ্নিউপাসক নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ফিরদৌস'র কী গগনচুম্বী গরিমা দম্ভ এবং সময় সময় আস্ফালন। এ যেন বিজয়ী আরবদের বারবার শুনিয়ে শুনিয়ে বলা, 'কালনেমির বিরূপাবর্তনে আজ আমাদের পতন ঘটেছে বটে, কিন্তু এই কাব্যে দেখ আমরা একদিন সভ্যতার কত উচ্চ শিখরে উঠেছিলুম। সে-দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো। ওখানে তোমরা কখনো' পৌঁছওনি, পৌঁছবেও না।' এ সুর কেমন যেন আমাদের চেনাচেনা মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ইংরেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে বার বার এই গান গেয়েছে ('অন্য জাতি দিগ্বসন পরিত যখন। ভারতে ঋগ্বেদ পাঠ হইত ত— [illegible]', কিন্তু, আফসোস! শাহ্‌নামার মত মহাকাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেনি। হেমচন্দ্র ও ইকবালকে ফিরদৌসীর আসনে বসানো কঠিন, এবং অন্যান্য কবিরা যে 'নিল'জ্জতা' দেখালেন ('নির্লজ্জতা' শব্দটি ভেবে চিন্তেই কুটেশনের ভিতর ফেললুম, কারণ কাব্যে রসস্বরূপে প্রকাশ পেলে চরম নির্লজ্জতাও পাঠকের মনে বিদ্রোহ সঞ্চার করতে পারে না। আমাদের দুই মাইডিয়ার হীরো পবননন্দন ভীমসেন ও হনুমান যে সব দম্ভ এবং আস্ফালন করেছেন তা স্বকর্ণে শুনতে হলে 'রাম রাম' বলতে হ'ত, কিন্তু কাব্যে পাঠ করে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়. মনে হয়, ঐ সময়ে, ঐ অবস্থায় এ বাক্য ছাড়া অন্য কিছুই এঁদের মুখে মানাতো না, বলতে ইচ্ছে করে, 'ধন্য ধন্য যুগ্ম-কবি যাঁরা দম্ভকে বিনয়, লজ্জাকে শ্লাঘায় পরিণত করতে পারেন!') সেটা ঢাকবার প্রয়াস আজও ইরানে-তুরানে সহজেই চোখে পড়ে। সকলেই জানেন, মুসলমানধর্মে মদ খাওয়া মানা।

আর সেই মদও যদি খাওয়া হয় তন্বঙ্গী তরুণী সাকীর সঙ্গে—যার সঙ্গে 'বে-থা' হয়েছে কিনা সে-সম্বন্ধেও কবিরা বড় মারাত্মক স্মৃতিশক্তিহীন—তাও আবার ঝরনাতলায় নির্জনে, সাঁঝের ঝোঁকে, যখন কিনা 'মগরিবের আইন ওক্তে' নামাজ পড়ার কথা, আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ করার আদেশ—এবং মনে মনে আওড়ানো,

"মত্ত, মাতাল ব্যসনী আমি গো আমি কটাক্ষ বীর"

তা হলে অবস্থাটা কি রকমের হয় ?

।কথা সত্য, মোল্লারা সুবো-শাম ভালো ভালো কেতাবপুঁথিই পড়েন, কিন্তু মাঝে-মধ্যে, নিতান্ত কালে-কস্মিনে দু'একখানা কাব্য-গ্রন্থের পাতাও তো তাঁরা ওলটান। কবি হাফিজ অবশ্য বিস্তর চলাচলির পর ওকাবহাল হয়ে অভয়বাণী বলেছিলেন,

"মোল্লার কাছে কোরো না কিন্তু মোর পিছে অনুযোগ,

তারো আছে, জেনো, আমারি মতন, সুরামত্ততা রোগ।"

তবু, এ-কথাও তো অজানা নয় যে, মোল্লারাই নীতিবাগীশ সাজে আর পাঁচজনের তুলনায় বেশী।

এবং কার্যতঃ দেখা গেল তারা এবং তাদের চেলাচামুণ্ডার দল ঝোপে ঝাপে বসে আছে, শরাব-কবাব জান-কী-সাকী সুদ্ধ কবিদের বমাল গ্রেফতার করার জন্য।

কবিরা—এবং বিশেষ ক'রে আমাদের মত তাঁদের গুণগ্রাহীরা,—উচ্চকণ্ঠে তখন বললেন, এ-সব কবিতা রূপকে নিতে হয়। মদ্য অর্থ ভগবৎপ্রেম, সাকী অর্থ যিনি সে প্রেম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, অর্থাৎ পীর, গুরু, মুরশীদ, পয়গম্বর। এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাফিজ, আত্তার, এমন কি ওমর খৈয়ামের বহু কবিতার কোনো অর্থই করা যায় না, যদি সেগুলো রূপক দিয়ে অর্থ না করা হয়। কিন্তু বাদবাকীগুলো ?

আমাদের পদাবলীতেও তাই। এবং বিস্তর সব পদ আছে যাতে মর্ত্য আর অমর্ত্য প্রেম এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, দুটোকে আদৌ আলাদা করা যায় না—সমস্ত হৃদয়-মন এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় নবরসে আপ্লুত হয়ে যায়।

তোমার চরণে আমার পরাণে

লাগিল প্রেমের ফাঁসী।

সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া

নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

মর্ত্য প্রেমই যদি হবে তবে তো 'পরাণে' 'পরাণে' প্রেমের ফাঁসী লাগবে। 'পরাণে' আর 'চরণে' প্রেমের বাঁধ বেঁধে দিয়ে কী এক অপূর্ব অতুলনীয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে—যার অনুভূতি এ-জগতে আরম্ভ, আর পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেই অমর্ত্যলোকে, 'ব্যর্থ নাহি হোক এ-কামনা।'

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে দ্বিধা জাগে, সর্বত্রই কি রূপকের শরণাপন্ন হ'তে হবে? যথা :—

অদ্যাপ্য শোক-নব পল্লব-রক্তহস্তাং
মুক্তাফলপ্রচয়চুম্বিত-চুচুকাগ্রাম্।
অন্তঃস্মিতেন্দুসিতপাণ্ডুরগণ্ডদেশাং,
তাং বল্লভাং রহসি সংবলিতাং স্মরামি॥

প্রথম অর্থ—বিদ্যাপক্ষে

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে।
কুচাগ্র শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥
অন্তরে ঈষৎ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরতের চন্দ্র যেন ত্রিলোক-মোহিত॥
নির্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥

দ্বিতীয়ার্থ—কালীপক্ষে

রুধির-খর্পর হস্তে দিবানিশি যার।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার॥
উচ্চ পয়োধরপরি বান্ধিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী॥
অন্তরে গভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্য কালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ ভালে॥
অন্তর জগতে দেখি আলোক বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে॥

স্ববল্লভ সংবলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জনে স্মরি তারে গো তারিণী ॥
(চোরপঞ্চাশৎ, ভারতচন্দ্র, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৮)

পূর্বোল্লিখিত এই সব তাবৎ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ওমরের বিদ্রোহ।

* * * *

গিয়াসউদ্দীন আবুল্ ফৎহ্ ওমর ইবন্ ইব্রাহীম অল-খৈয়াম ইরান-দেশের নিশাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিন কিংবা সন ঠিকমত জানা যায় নি, এমনকি তাঁর মৃত্যুর সনও মোটামুটি ১১২৩ খৃষ্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

খৈয়াম শব্দের অর্থ তাম্বু নির্মাতা। এ ওজনের শব্দ বাঙলায় আরো আছে। 'কত্তাল' থেকে বাঙলা কোতয়াল, এবং 'খম্মার' থেকে 'খোঁয়ারী' (ভাঙা) শব্দ এসেছে। রান্নার মশলা-বিক্রেতা অর্থে 'বক্কাল' শব্দও একদা বাঙলাতে সুপ্রচলিত ছিল—আরবীতে শব্দটির অর্থ 'মুদী' বা 'মশলা-বিক্রেতা' ত্রিবর্ণর মূল ধাতুতে— যথা 'দ-খ-ল' ('দখল করা'), 'ক-ত-ল' ('কোতল করা)—দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করে তাতে দীর্ঘ 'আ'-কার যোগ করলে যে কর্তা-বাচক শব্দ উৎপন্ন হয় তার অর্থ 'ঐ কর্ম সে পুনঃ পুনঃ করে থাকে।' তাই 'খম্মার' অর্থ 'যে ঘন ঘন মদ খায়' (বাঙলায় তাই সে সকালবেলা খম্মারী বা খোঁয়ারী ভাঙে) অর্থাৎ 'পাইকারী মাতাল', 'মদ খাওয়া তার ব্যবসা'। 'কতল' করা যার ব্যবসা সে কোতয়াল ('কত্তাল'), 'জল্লাদ'ও ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। 'খয়্যাম' অর্থ 'যে পুনঃ পুনঃ তাম্বু নির্মাণ করে'—'তাম্বু-নির্মাণকারী'। বাঙলায় 'খইআম', 'খইয়াম' বা 'খৈয়াম' লিখলে মোটামুটি মূল উচ্চারণ আসে। অবশ্য 'খ'-র উচ্চারণ বাঙলা মহাপ্রাণ 'খ'-র মত নয়—আমরা বিরক্ত হলে যে রকম 'আখ'-এর 'খ' অক্ষরটি উচ্চারণ করে থাকি অর্থাৎ ঘৃষ্ট্য কণ্ঠ্যব্যঞ্জন। স্কচের 'লখ' ও জর্মনের 'বাখ'-এর 'খ'-এর মত। আসামীতে 'অহমিয়া'র 'হ' অনেকটা সেই রকম।

কিন্তু কবি ওমর তাঁবুর ব্যবসা করতেন না। ওটা তাঁর বংশের পদবী মাত্র। আজকের দিনের সব সরকারই যে-রকম রাইটারজ বিল্ডিঙে চীফ সেক্রেটারী (সরকার) নন, কিংবা মাত্রই ঘটকপদবীধারী যে-রকম সমাজে কুলাচার্যের কর্ম করেন না। ওমর কিন্তু তাঁর পরিবারের এই উপাধিটি নিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি—

জ্ঞান-বিজ্ঞান ন্যায়-দর্শন সেলাই করিয়া মেলা
খৈয়াম কত না তাম্বু গড়িল ; এখন হয়েছে বেলা
নরককুণ্ডে জ্বলিবার তরে। বিধি-বিধানের কাঁচি
কেটেছে তাম্বু—ঠোক্কর খায়, পথ-প্রান্তের ঢেলা।

(লেখকের এমেচারী অক্ষম অনুবাদে রসিক পাঠক অপরাধ নেবেন না ; অন্য কারো অনুবাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে-মধ্যে এ ধরনের 'অনুবাদ' ব্যবহার করতে হয়েছে।)

এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন রুবাঈ জাতীয় শ্লোকে প্রায়শঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মিল থাকে—তৃতীয় ছত্রান্ত স্বাধীন। ইরানী আলঙ্কারিকরা বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষ মিলে বেশী ঝোঁক পড়ে এবং শ্লোক সমাপ্তি তার পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতা পায়। কথাটা ঠিক, কারণ আমরাও তেতাল বাজাবার সময় তৃতীয়ে এসে খানিকটা কারচুপি করলে সম মনকে ধাক্কা দেয় আরো জোরে। পাঠককে এই বেলাই বলে রাখি, তৃতীয় ছত্রে মিলহীন এই জাতীয় শ্লোক পড়ার অভ্যাস করে রাখা ভালো। নইলে নজরুল ইসলামের ওমর-অনুবাদ পড়ে পাঠক পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ কাজী আগাগোড়া ক ক খ ক মিলে ওমরের অনুবাদ করেছেন। কান্তি ঘোস করেছেন বাঙলা রীতিতে, অর্থাৎ ক ক খ খ।

ভাগ্যক্রমে ওমরের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাকাপাকি শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং অবসর কাটাবার জন্য দৈবেসৈবে চতুষ্পদী লিখতেন—তাঁর নামে প্রচলিত গজল, মসনবী বা অন্য কোন শ্রেণীর দীর্ঘতর কবিতা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এইটুকু সংবাদ ছাড়া বাদবাকী কিংবদন্তী। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যাঁর পরলোকগমনের সন পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণাধীন, তাঁর সম্বন্ধে যে প্রচুর কিংবদন্তী প্রচলিত থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

তবে তিনি যে উত্তম গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। স্মরণ রাখা ভালো যে, ছাপাখানার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত অল্প লোকই গুরুর সাহায্য বিনা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কথিত আছে, বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম মুওয়াফ্‌ফকের কাছে একই সময়ে তিনজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র শিক্ষালাভ করেন। এঁদের ভিতর খেলাচ্ছলে চুক্তি হয় যে, এদের কোনো একজন পরবর্তী জীবনে প্রভাবশালী হতে পারলে

তিনি অন্য দু'জনকে সাহায্য করবেন। এঁদের একজন কালক্রমে প্রধানমন্ত্রী বা নিজাম-উল-মুল্ক-এর পদ প্রাপ্ত হন। খবর পেয়ে দ্বিতীয় বন্ধু হাসন বিন্‌সব্‌বাহ তাঁর কাছে এসে তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উচ্চ রাজকর্ম চান। বন্ধুর কৃপায় আশাতীত উচ্চপদ পেয়েও হাসন তাঁকে সরিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কিন্তু শেষটায় ধরা পড়ে বাদশার হুকুমেই রাজপ্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত হন। হাসন প্রতিশোধ নেবার জন্য এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গোপন আততায়ী দিয়ে অনেক লোককে হত্যা করিয়ে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ক্রুসেডের একাধিক খৃষ্টান নেতা এইসব গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন। এরা ভাঙ জাতীয় এক প্রকার হশীশ্‌ সেবন করতো বলে এদের নাম হয়েছিল 'হশীশীয়্যূন', এবং ইংরিজি 'এ্যাসাসিন'—গুপ্তঘাতক—এই শব্দ থেকেই অর্বাচীন লাতিন তথা ফরাসীর মাধ্যমে এসেছে। অনেকে বলেন, পরবর্তীকালে নিজাম-উল্‌-মুল্ক যে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন, সেও হাসন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের সম্বন্ধে লেখকের 'অরিজিন অব দি খোজা' পুস্তক লেখকের বাল্যরচনা বলে দ্রষ্টব্যের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

ওমরকে যখন নিজাম উল্‌-মুল্ক উচ্চপদ দিতে চাইলেন তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নির্জনে অনটনবিহীন জীবনযাপনের সুবিধাটুকু মাত্র চাইলেন। এতো জানা কথা। যে ব্যক্তি স্বর্গ-সুখ বলতে বোঝে,

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু স্বর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।

(কান্তি ঘোষ)

কিংবা –

আমার সাথে আসবে যেথায়—দূর সে রেখে শহরগ্রাম
এক ধারেতে মরু তাহার, আর একদিকে শষ্প শ্যাম।
বাদশা-নফর নাইকো সেথা—রাজ্য-নীতির চিন্তা-ভার,
মামুদ শাহ ?—দূরে থেকেই করব তাঁকে নমস্কার।

(কান্তি ঘোষ)

তার রাজপদ নিয়ে কি হবে? নিজাম-উল্‌-মুল্ক বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন, ওমরের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রত্যাখ্যান মৌখিক বিনয় নয় এবং তাঁর জন্য

সচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। কবিও কখনো তাঁর মত পরিবর্তন করেননি। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যের মূল সুর ঐটিই।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ডাক পড়লো রাজদরবারে—পঞ্জিকা সংশোধন করে দেবার জন্য। ইরানীদের 'নওরোজ' বা নববর্ষ আসে বসন্ত ঋতুতে, কিন্তু বহু শত বৎসর লীপ ইয়ার গোনা হয়নি বলে তখন আর নববর্ষ বসন্ত ঋতুতে আসছিল না। ওমর ঐ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'রে দিলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কবিরূপে যে ব্যক্তি বিশ্বজগতে বিখ্যাত তিনি আসলে ছিলেন বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, ফিটস্‌জেরাল্ডের মাধ্যমে ইয়োরোপে প্রচারিত হবার পূর্বেই ওমরের বিজ্ঞানচর্চা ফ্রান্সে অনূদিত হয়ে সেখানে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান লেখক এসব লেখা দেখবার সুযোগ পায়নি, তাই এনসাইক্লোপীডিয়ার 'কোনিক্ সেক্‌শন' অনুচ্ছেদ থেকে ইয়োরোপে ওমরের বৈজ্ঞানিক যশ সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"Greek mathematics culminated in Apollonius. Little further advance was possible without new methods and higher points of view. Much later, Arabs and other Muslims absorbed the classical science greedily ; it was the Persian poet Omar Khayyam, one of the most prominent mediaeval mathematicians, with his remarkable classification and systematic study of equations, which he emphasized, who blazed the way to the modern union of analysis and geometry. In his "Algebra" he considered the cubic as soluble only by the intersection of conics, and the biquadratic not at all."

শেষ ছত্রটির বাঙলায় অনুবাদ মূল ইংরিজি, এমন কি আধুনিক বাঙলা কবিতার চেয়েও শক্ত হয়ে যাবে বলে গোটা টুকরোটাই অতি অনিচ্ছায় ইংরিজিতেই রেখে দিতে বাধ্য হলুম। বৈজ্ঞানিক পাঠক বিনা অনুবাদেই এটি বুঝতে পারবেন, প্রাঞ্জল অনুবাদেরও আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের কোনো লাভ হবে না।

ইরানের অধিকাংশ গুণীই একমত যে, ওমর তাঁর জীবনের প্রায় সব সময়-টুকুই কাটিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চায় এবং অতি অল্প সামান্য সময় 'নষ্ট' করেছেন

কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায়। তাই দীর্ঘ কবিতা লেখবার ফুরসৎ তাঁর হয়ে ওঠেনি এমন কি রুবাঈগুলোও গীতিরস দিয়ে সরস করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি।

গণিত এবং বিশেষ করে জ্যোতিষচর্চার ফল ওমরের কাব্যে পদে পদে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গ্রহ-নক্ষত্র যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে চলে তার থেকেই তিনি দৃঢ় মীমাংসায় উপনীত হন যে, মানুষেরও কোনো প্রকারের স্বাধীনতা নেই, তার কর্মপদ্ধতি স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকারই সে পায়নি। তাই—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই। (সত্যেন দত্ত)

পৃথ্বী হ'তে দিলাম পাড়ি, নভঃগেহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিদ্যাটা মোর উঠলো ফেঁপে কাটলো কত ধাঁধার ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্যলিখন—ওইখানে গোল রইল মোর।
(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু এস্থলে আমি ওমর-কাব্যের মল্লিনাথ হবার দুরাশা নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হইনি। ওমরের নাম প্রচলিত প্রায় ছ'শ'টি রুবাইয়াৎ ইরানী বটতলাতেও পাওয়া যায়—পার্টিশনের পূর্বে কলকাতার ফার্সী বটতলা তালতলা অঞ্চলেও পাওয়া যেত। তার অতি অল্পই অনুবাদ করেছেন ফিটস্‌জেরাল্ড এবং সেই ছ'শ'-র ক'টি কবিতা ওমরের নিজস্ব, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাক্‌-বিতণ্ডা এখনো শেষ হয়নি—আমার বিশ্বাস কখনো হবে না। সেই ছ'শ' চতুষ্পদীর টীকা পড়ার উৎসাহ ও ধৈর্য রসিকজনের থাকার কথা নয়—পণ্ডিতের থাকতে পারে। আমি রসিকের সেবা করি।

তাই আমিও ওমরের সামান্যতম ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করার চেষ্টা করছি এবং তাও শুধু ওমরের বিদ্রোহী মনোভাব দেখবার জন্য—কারণ ঐখানেই নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

ওমরের প্রধান বিদ্রোহ ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে :

খাজা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জি এই
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।

দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো, ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।

(কাজী সাহেবের অনুবাদ)

O master ! grant us only this, we prithee ;
Preach not ! But mutely guide to bliss,
we prithee !
"We walk not straight"—Nay,
it is thou who squintest !
'Go, heal thy sight, and leave us in peace,
we prithee !

(কার্ণের অনুবাদ)

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক রাজা-রাজড়ার শৌর্যবীর্য নিয়ে যেসব কবি ফিরদৌসীর ন্যায় আস্ফালন করে বর্তমানের আনন্দকে অবহেলা করতেন তাঁদের সম্বন্ধে বলছেন—

ভা গ্য-লিপি মিথ্যা সে নয়—ফুরোয় যা' তা ফুরিয়ে যাক্,
কৈকোবাদ আর কৈখ্‌সরুর ইতিহাসের নামটা থাক।
রুস্তম আর হাতেম-তায়ের কল্পকথা—স্মৃতির ফাঁস—
সে-সব খেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে আজকে এস আমার পাশ।

(কান্তি ঘোষ)

দরবেশ-সুফীরা করতেন কৃচ্ছ্রসাধন এবং যোগচর্চা। পূর্বেই নিবেদন করেছি, তাঁরা নৃত্যের সঙ্গে চিৎকার করতেন নাম জপ, তাঁদের বিশ্বাস, ঐ করেই ভগবৎপ্রেম এবং চরম মোক্ষ পাওয়া যায়!

দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটি তার না জানি কতই গুণ,—
জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর, দরবেশী সাঁই যাই বলুন—
গগনভেদী চীৎকারে তাঁর খুলবে নাকো মুক্তিদ্বার,
অস্থিতে এই মিলবে যে খোঁজ সেই দুয়ারের কুঞ্চিকার। (কান্তি ঘোষ)

কিন্তু সবচেয়ে বেশী চতুষ্পদী তিনি রচনা করেছেন দার্শনিক এবং পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে। সেখানে তিনি জ্যোতির্বিদ ওমরকেও বাদ দেননি।

অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান
বীজগণিতের সূত্র-রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান ;

বিদ্যারসে যতই ডুবি, মনটা জানে মনে (মানে ?) স্থির—
দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রসজ্ঞানে নেই গভীর।

অর্থহীন, অর্থহীন, সমস্তই অর্থহীন। তাই ওমরের বারবার কাতর রোদন, দরদী ফরিদায়—

হেথায় আমার আসাতে প্রভু হননি তো লাভবান
চলে যাবো যবে হবেন না তিনি কোনো মতে গরীয়ান।
এ কর্ণে আমি শুনিনি তো কভু কোনো মানবের কাছে
এই আসা-যাওয়া কি এর অর্থ—খামখা পোড়েন টান। (লেখক)

তাই ওমরের শেষ মীমাংসা—একবার মরে যাবার পর তুমি আর এখানে ফিরে আসবে না। অতএব যতটুকু পারো, যতক্ষণ পারো দর্শন-বিজ্ঞান-সাঁই সুফীদের ভুলে গিয়ে সাকী সুরা নিয়ে নির্জন কোণে আনন্দ করো।

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে।
লে আও শরাব—লাও ঝটপট—রাঙানো গোলাপী রাগে।
হায়রে মূর্খ। সোনা দিয়ে মাজা তোর কি শরীরখানা—?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই
কি কাজে লাগে। (লেখক)

কিন্তু একটা জিনিস ভুল করলে চলবে না। ওমর খাঁটি চার্বাকপন্থী এবং ঐ জাতীয় লোকায়তীদের মত নন। 'ঋণ ক'রে ঘি খাও, কারণ দেহ ভস্মীভূত হলে ঋণ তো আর শোধ করতে হবে না,' অর্থাৎ ইহসংসারে কিংবা পরলোকে অন্য কারো প্রতি তোমার কোনো নৈতিক দায়িত্ব—মরাল রেসপনসিবিলিটি নেই—এ তত্ত্বেও ওমর বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর একমাত্র উপদেশ—

কারুর প্রাণে দুখ্‌ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর-আশিস্‌ লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি স'য়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ! (নজরুল ইসলাম)

গুণীরা বলেন, 'কুরানই কুরানের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা।' তরুণদের আমি প্রায়ই বলি, রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা—ঐ কাব্যই বারবার অধ্যয়ন করো, অন্য টীকার প্রয়োজন নাই।' ওমরই ওমরের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লিনাথ এবং কান্তীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী॥

১৯৫৯।

ত্রিমূর্তি (চাচা কাহিনী)

বার্লিন শহরের উলাণ্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুস্থান হৌস' নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর সুদূরতম কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা— বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান—আর চেলারা গোঁসাই, মুখুয্যে, সরকার, রায় এবং চ্যাংড়া গোলাম মৌলা, এই ক'জন।

চাচার ন্যাওটা শিষ্য গোঁসাই বললেন, 'যা বলো, যা কও, চাচা না থাকলে আমাদের আড্ডাটা কিরকম যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। তা বলুন, চাচা, দেশের— না, ত্মাশের—খবর কি? কি খেলেন, কি দেখলেন, বেবাক কথা খুলে কন।'

চাচা বরিশাল গিয়েছিলেন। তিন মাস পরে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'কি খেলুম? কই মাছ—এক-একটা ইলিশ মাছের সাইজ; ইলিশ মাছ—এক-একটা তিমি মাছের সাইজ, আর তিমি মাছ—তা সে দেখিনি। তবে বোধ হয়, তাবৎ বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টাই তারই একটার পিঠের উপর ভাসছে। ঐ যেরকম সিন্দবাদ তিমির পিঠটাকে চর ভেবে তারই পিঠের উপর রসুই চড়িয়েছিল।'

বাকি কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সক্কলের দৃষ্টি চলে গেল দোরের দিকে। দুটি জর্মন চ্যাংড়া একটি চিংড়িকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভারতীয় রান্নার ঝালের দাপটে জর্মনরা সচরাচর হিন্দুস্থান হৌসে আসতো না। পাড়ার জর্মনরা তো আমাদের লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে পয়লা বিশ্বযুদ্ধের ডিসপোজেলের গ্যাস-মাস্ক পরতো। তবে দু'একজন যে একেবারেই আসতো না তা নয়— ইণ্ডিশে রাইস-কুরি' অর্থাৎ ভারতীয় ঝোল-ভাতের খুশবাই জর্মনি হাঙ্গেরি সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আলতোভাবে ওদের উপর নজর বুলিয়ে নিয়ে আড্ডা পুনরায় চাচার দিকে তাকাল। চাচা বললেন, 'খাইছে! আবার সেই ইনটারনেল্ ট্রায়েঙ্গল্!'

পাইকিরি বিয়ার-খেকো সূয্যি রায় বললে, 'চাচা হরবকতই ট্রায়েঙ্গল দেখেন। এ যেন ঘামের ফোঁটাতে কুমীর দেখা। ত্থ ত্রো নিয়ে কি কেউ কখনো বেরয় না?'

রায়ের গ্রাম সম্পর্কে ভাগ্নে, সতেরো বছরের চ্যাংড়া সদস্য লাজুক গোলাম মৌলা শুধালে, 'মামু, ত্থ ত্রো কারে কয়?'

রায় বললেন, 'পই পই করে বলেছি ফরাসী শিখতে, তা শিখবিনি। ডি, ই ত্থ; টি, আর, ও, পি ত্রো—পি সাইলেন্ট। অর্থাৎ একজন অনাবশ্যক বেশী—One too many। এই মনে কর, তুই যদি তোর ফিয়াঁসেকে—এ কথাটাও বোঝাতে হবে নাকি?—নিয়ে বেরোস আর আমি খোদার-খামোখা তোদের সঙ্গে জুটে যাই, তবে আমি ত্থ ত্রো। বুঝলি?'

গোলাম মৌলা মাথা নিচু করে সেই বার্লিনের শীতে বরাব্বর লজ্জায় ঘামতে লাগলো।

আড্ডার লটবর লেডি-কিলার পুলিন সরকার মৌলাকে ধমক দিয়ে বললে, 'তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেনরে বুড়বক্? লজ্জা পাবেন রায়। ডাণ্ডা-গুলি খেলার সময় গুলিকে ভয় দেখাস্‌নি ডাণ্ডাকে না ছোঁবার জন্য। তখন কি বলিস? 'ভাগ্নে বৌ দুয়ারে—কোনা কেটে ফালদি যা।' বরঞ্চ সূয্যি রায় যদি তাঁর ম্যাডামকে নিয়ে বেরোন, আর তুই যদি সঙ্গে জুটে যাস, তবু কিন্তু তুই ত্থ ত্রো নস্। রাধা কেষ্টর কি হন জানিস তো?'

গোলাম মৌলা এবারে লজ্জায় জল না হয়ে একেবারে পানি।

গোসাই বললেন, 'চাচা আপনি কিন্তু যেভাবে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আপনি একদম শোয়ার, এ হচ্ছে দুটো-হুনো-একটা মেনীর ব্যাপার। তা কি কখনো হওয়া যায়?'

চাচা বললেন, 'যায়, যায়, যায়। আকছারই যায়। অবশ্য প্র্যাকটিস থাকলে?'

আড্ডা সমস্বরে বললে, 'প্র্যাকটিস!'

চাচা বললেন, 'হু। এবারে দেশে যাবার সময় জাহাজে হয়েছে।

গল্পের গন্ধ পেয়ে আড্ডা আসন জমিয়ে বললে, 'ছাড়ুন, চাচা।'

চাচা বললেন, 'এবার দেখি, জাহাজ ভর্তি ইহুদির পাল। জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ঝেঁটাই করে সবাই যাচ্ছে শাংহাই। সেখানে যেতে

নাকি ভিজার প্রয়োজন হয় না। কি করে টের পেয়েছে, এবারে হিটলার দাবড়াতে আরম্ভ করলে নেবুকাডনাজারের বেবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটি নয়, এবারে স্রেফ কচু-কাটার পালা। তাই শাংহাই হয়ে গেছে ওদের ল্যাণ্ড অব মিল্‌ক্ এণ্ড হানি, ননীমধুর দেশ।

আমার ডেক-চেয়ারটা ছিল নিচের তলা থেকে ওঠার সিঁড়ির মুখের কাছে। ডাইনে এক বুড়ো ইহুদি আর বাঁয়ে এক ফরাসী উকিল। ইহুদি ভিয়েনার লোক, মাতৃভাষা জর্মন, ফরাসী জানে না। আর ফরাসী উকিল জর্মন জানে না, সে তো জানা কথা। ফরাসী ভাষা ছাড়া পৃথিবীতে অন্য ভাষা চালু আছে সে তত্ত্ব জাহাজে উঠে সে এই প্রথম আবিষ্কার করলে। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর সর্বত্র ভাঙা-ভাঙা ফরাসী, পিজিন ফ্রেঞ্চই চলে—বিদেশীরা প্যারিসে এলে যে রকম টুকিটাকি ফরাসী বলে ঐ রকম আর কি।

তিনজনাতে তিনখানা বই পড়ার ভান করে এক একবার সিঁড়ি দিয়ে উঠনে-ওলা নামনে-ওলা চিড়িয়াগুলোর দিকে তাকাই, তারপর বইয়ের দিকে নজর ফিরিয়ে আপন আপন সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করি।

একটি মধ্যবয়স্কা উঠলেন। জর্মন ইহুদি বললে, 'হাল্‌ব্-উন্‌ট্-হাল্‌ব্'—অর্থাৎ হাফাহাফি।' ফরাসী বললে, 'অঁ প্যো আঁসিয়েন্'—একটুখানি এনশেণ্ট।' জর্মন আমাকে শুধালে, 'ফ্রেঞ্চি কি বললে?' আমি অনুবাদ করলুম। জর্মন বললে, 'চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ হবে। তা আর এমন কি বয়স—নিষ্‌ট্ ভার—নয় কি?' ফরাসী আমাকে শুধালে 'ক্য দি তিল্?'—কি বললে ও?' উত্তর শুনে বললে, 'ম' দিয়ো ইয়াল্লা চল্লিশ আবার বয়স নয়! একটা কেথাড্রেলের পক্ষে অবশ্য নয়। কিন্তু মেয়েছেলে, ছোঃ!'

এমন সময় হঠাৎ এক সঙ্গে তিনজনের তিনখানা বই ঠাস করে আপন উরুতে পড়ে গেল। কোর্ট-মার্শালের হুকুম মোতাবেক যে রকম দশটা বন্দুক এক ঝটকায় গুলি ছোড়ে। কি ব্যাপার? দ্যাখ্‌তো না দ্যাখ্, সিঁড়ি দিয়ে উঠলো এক তরুণী!

সে কী চেহারা! এ রকম রমণী দেখেই ভারতচন্দ্রের মুণ্ডুটি ঘুরে যায় আর মানুষে দেবতাতে ঘুলিয়ে ফেলে বলেছিলেন, 'এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।'

ইটালির গোলাপী মার্বেল দিয়ে কোঁদা মুখখানি, যেন কাজল দিয়ে আঁকা দুটি ভুরুর জোড়া পাখিটি গোলাপী আকাশে ডানা মেলেছে, চোখ দুটি সমুদ্রের ফেনার

উপর বসানো দুটি উজ্জ্বল নীলমণি, নাকটি যেন নন্দলালের আঁকা সতী অপর্ণার আবক্ররেখা মুখের সৌন্দর্যকে দু'ভাগ করে দিয়েছে, ঠোঁট দুটিতে লেগেছে গোলাপ ফুলের পাপড়িতে যেন প্রথম বসন্তের মৃদু পবনের ক্ষীণ শিহরণ।'

চাচা বললেন, 'তা সে যাক্‌গে। আমার বয়সে হয়েছে। তোদের সামনে সব কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অপূর্ব, অপূর্ব।

দেখেই বোঝ যায়, ইহুদি—প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় সৌন্দর্যের অদ্ভুত সম্মেলন।

জর্মন এবং ফরাসী দুজনাই চুপ। আমো।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছোকরা জাহাজের দু'প্রান্ত থেকে চুম্বকে টানা লোহার মত তার গায়ের দু'দিকে যেন সেঁটে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এতক্ষণ ধরে দু'জনাই তার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল।

জাহাজে প্রথম দু' একদিন ঠিক আঁচা যায় না, শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে কার পাকাপাকি দোস্তী হবে। কোন্ মঁসিয়ো কোন্ মাদ্‌মোয়াজেলের পাল্লায় পড়বেন, কোন্ হার্ কোন্ ফ্রাউ ব ফ্রলাইনের প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, কোন্ মিসিস কোন্ মিস্টারের সঙ্গে রাত তেরোটা অবধি খোলা ডেকে গোপন প্রেমালাপ করবেন। এ তিনটির বেলা কিন্তু সবাই বুঝে গেল এটা ইটার্নেল্ ট্রায়েঙ্গল। আমি অবশ্য গোঁসাইয়ের মত প্রথমটায় ভাবলুম, হার্মলেস ব্যাপারও হতে পারে।

মেয়েটা ফরাসির, ছেলে দুটোর একটা মারাঠা, আরেকটা গুজরাতি বেনে। প্যারিস থেকেই নাকি রঙ্গরস আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই অবধি গড়াবে। উপস্থিত কিন্তু আমাদের তিনজনারই মনে প্রশ্ন জাগলো, আখেরে জিতবে কে?

শুনেছি, এহেন অবস্থায় দুজনাই স্পানিয়ার্ড হলে ডুয়েল লড়ে, ইতালীয় হলে একজন আত্মহত্যা করে, ইংরেজ হলে নাকি একে অন্যকে গম্ভীরভাবে স্টিফ বাও করে দু দিকে চলে যায়, ফরাসী হলে নাকি ভাগাভাগি করে নেয়।

প্রথম ধাক্কাতেই গুজরাতি গেলেন হেরে। মারাঠাটা চালাকী করে ডবল পয়সা খর্চা করে দু'খানি ডেক-চেয়ার ভাড়া করে রেখেছিল পাশাপাশি। বেনের মাথায় এ বুদ্ধিটা খেললো না কেন আমরা বুঝে উঠতে পারলুম না। মারাঠা নটবর সেই হুরীকে নিয়ে গেল জোড়া ডেক-চেয়ারের দিকে—স্যর ওয়ালটর রেলে যে রকম রানী ইলিজাবেথকে কাদার উপর আপন জোব্বা ফেলে দিয়ে হাত ধরে ওপারের পেভমেণ্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দু'জনা লম্বা হলেন দুই ডেক-চেয়ারে। বেনেটা ক্যাবলাকান্তের মত সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা কাঁই-কুঁই করে কেটে পড়লো।

আমার পাশের ফরাসী বললে, 'ইডিয়ট!' জর্মন শুনে বললে 'নাইন, আখেরে জিতবে বেনে।' 'এ্যাপসিব্‌ল্!' 'বেট্?' 'বেট্!' 'পাঁচ শিলিঙ?' 'পাঁচ শিলিঙ!'

আড্ডার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাচা বললেন, 'বিশ্বাস করো আর নাই করো, আস্তে আস্তে জাহাজের সবাই লেগে গেল এই বাজি ধরাধরিতে! বুকিরও অভাব হল না। আর সে বেট্ কী অদ্ভুত ফ্লাক্‌চুয়েট করে। কোনোদিন ভোরে এসে দেখি জর্মনটা গুম্ হয়ে বসে আছে—যেন জাহাজ একটা কনসানট্রেশন ক্যাম্প—আর ফরাসীটা উল্লাসে ত্রিং ত্রিং করে পল্‌কা নাচ নাচছে। ব্যাপার কি? পাক্কা খবর মিলেছে, আমাদের পরীটি কাল রাত দু'টো অবধি মারাঠার সঙ্গে গুজুর-গুজুর করেছেন। বেনে মনের খেদে এগারোটাতেই কেবিন নেয়। ফরাসী এখন সক্কলের গায়ে পড়ে থ্রি টু ওয়ান অফার করছে। সে জিতলে পাবে কুল্লে এক শিলিং, হারলে দেবে তিন শিলিং। নাও, বোঝ ঠ্যালা! আর কোনোদিন বা খবর রটে, বেনের পো জাহাজে ক্যাম্বিসের চৌবাচ্চায় হুরীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে—মারাঠা জলকে ভীষণ ডরায়। ব্যস্, সেদিন বেনের স্টক স্কাই হাই!

ইতিমধ্যে একদিন বেনের বাজার যখন বড্ড ঢিলে যাচ্ছে তখন ঘটলো এক নবীন কাণ্ড। হুরী ও মারাঠা তো বসতো পাশাপাশি কিন্তু লাইনের সর্বশেষে নয় বলে হুরীর অন্য পাশে বসতো এক অতিশয় গোবেচারা ভালো মানুষ নিগ্রো পাদ্রী। সে গিয়ে তার ডেক-চেয়ারের সঙ্গে বেনের ডেক-চেয়ারের বদলাবদলির প্রস্তাব করেছে। বেনে নাকি উল্লাসে ইয়াল্লা বলে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল। বেটিঙের বাজার আবার স্টেডি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠলো, এ বেটিঙের শেষ ফৈসালা হবে কি প্রকারে? বহু বাক্-বিতণ্ডার পর স্থির হলো, যেদিন হুরী মারাঠা কিংবা বেনের সঙ্গে তার কেবিনে ঢুকবেন সেদিন হবে শেষ ফৈসালা। যার সঙ্গে ঢুকবেন তার হবে জিত।

দু'একজন রুচিবাগীশ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ফরাসী উকিল হাত-পা চোখ-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিল, 'C'est, c'est, এটা, এটা হচ্ছে একটা লিগাল ডিসিশন, একটা আইনত ন্যায্য হক্কের ফৈসালা। ঢলাঢলির কোনো কথাই হচ্ছে না।'

রেসের বাজি তখন চরমে। কখনো বেনে, কখনো মারাঠা। সেই সে চণ্ডুখোর গল্প বলেছিল, পাখিকে গুলি মেরে সঙ্গে সঙ্গে শিকারী কুকুরকেও দিয়েছে

লেলিয়ে। তখন বুলেটে কুকুরে কী রেস্—কভী কুত্তা, কভী গুলি, কভী গুলি, কভী কুত্তা।

এমন সময় আদন বন্দর পেরিয়ে আমরা ঢুকলুম আরব সাগরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঠেরো হাজার টনের জাহাজকে মারলে মৌসুমী হাওয়া তার বাইশ হাজারী টনের থাবড়া। জাহাজ উঠলো নাগর বেনাগর সবাইকে নিয়ে নাগরদোলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সী সিক্‌নেস! বমি আর বমি। প্রথম ধাক্কাতেই মারাঠা হল ঘায়েল। রেলিঙ ধরে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার চেষ্টা দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল কেবিনে। বেনের মুখে শুকনো হাসি, কিন্তু তিনিও আরাম বোধ করছেন না! পরদিন সমুদ্র ধরলো রুদ্রতর মূর্তি। এবারে হুরী পড়ে রইলেন একা। তাঁর মুখও হরতালের মত হলদে। তারপরের দিন ডেক প্রায় সাফ। নিতান্ত বরিশালের পানি-জলের প্রাণী বলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কোনোগতিকে আমি টিকে আছি আর কি? খাবার সময় পেটে যা যায় সে-সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে। মোকামে পৌঁছবার আগেই ফিরিফিরি করছে। হুরী নিতান্ত একা বলে ফরাসী বন্ধু তাকে আদর করে ডেকে এনে আমাদের পাশে বসালে।

সে রাত্রে জাহাজ খেলো ঝড়ের মোক্ষমতম থাবড়া। ফরাসী গায়েব। হুরী এই প্রথম ছুটে গিয়ে ধরলো রেলিঙ। আমিও এই যাই কি তেই যাই। তবু ধরলুম গিয়ে তাকে। হুরী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'কেবিন'। আমি ধরে ধরে কোনোগতিকে তাকে তার কেবিনের দিকে নিয়ে চললুম। দুজনাই টলটলায়মান। আমার কেবিনের সামনে পৌঁছতেই ঝড়ের আরেক ধাক্কায় খুলে গেল আমার কেবিনের দরজা। ছিটকে পড়লুম দুজনাই ভিতরে। কি আর করি? তাকে তুলে ধরে প্রথম বিছানায় শোয়ালুম। তারপর কেবিন-বয়কে ডেকে দু'জনাতে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলুম তার কেবিনে। বাপ্‌স্।'

চাচা থামলেন। একদম থেমে গেলেন।

আড্ডার সবাই একবাক্যে শুধালে, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'কচু, তারপর আর কি?'

তবু সবাই শুধায়, 'তারপর।'

চাচা বললেন, 'এ তো বড় গেরো। তোরা কি ক্লাইমেক্‌স্ বুঝিসনে? আচ্ছা, বলছি! ভোর হতেই বোম্বাই পৌঁছলুম ডেকে যাওয়া মাত্রই সবাই আমাকে জাবড়ে ধরে কেউ বলে ফেলিসিতাসিয়োঁ, মঁসিয়ো, কেউ বলে, কনগ্রাচুলেশনস্,

কেউ বলে গ্রাতুলিয়েরে—তুচ্ছাই, এ-সব কি? কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি বুঝিয়ে বলে না।

শেষটায় ফরাসী উকিলটা বললে, 'আ মঁসিয়ো, কী কেরদানিটাই না দেখালে। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। মহারাষ্ট্র গুজরাত দু'জনাই হার মানলে। জিতলে বেঙ্গল! ভিভ্ ল্যা বাঁগাল! লং লিভ বেঙল!'

আমি যতই আপত্তি করি কেউ কোনো কথা শোনে না।

আর শুধু কি তাই? ব্যাটারা সবাই আপন আপন বাজির টাকা ফেরত পেল—বেনে কিংবা মারাঠা কেউ জেতেনি বলে। কিন্তু আমার দশ শিলিং স্রেফ, বেপরোয়া, মেরে দিলে। বলে কি না, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে জিতেছি, আমার বাজি ধরার হক্ক নেই। টাকাটা নাকি তছরূপ হয়ে যায়।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাচা বললেন, 'কিন্তু সেই থেকে আমার চোখ বলে দিতে পারে ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গল কোথায়।'

এমন সময় সেই তুই জর্মন ছোকরায় লেগে গেল মারামারি। সেটা থামাতে গিয়ে আড্ডা সেদিন ভঙ্গ হল॥

মামদোর পুনর্জন্ম

সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল। কোনো নূতন চিন্তা, অনুভূতি কিংবা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ধার করার কথা না ভেবে আপন ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করে, এমন কোনো ধাতু বা শব্দ সেখানে আছে কি না যার সামান্য অদলবদল করে কিংবা পুরনো ধাতু দিয়ে নবীন শব্দটি নির্মাণ করা যায় কি না। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, সংস্কৃত কস্মিনকালেও বিদেশী কোনো শব্দ গ্রহণ করেনি। নিয়েছে, কিন্তু তার পরিমাণ এতই মুষ্টিমেয় যে, সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলাতে কারও কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

প্রাচীন যুগের সব ভাষাই তাই। হীব্রু, গ্রীক, আবেস্তা এবং ঈষৎ পরবর্তী যুগের আরবীও আত্মনির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমান যুগের ইংরিজি ও বাঙলা আত্মনির্ভরশীল নয়। আমরা প্রয়োজন মত এবং অপ্রয়োজনেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ নিয়েছি এবং নিচ্ছি। পাঠান-মোগল যুগে আইন-আদালত খাজনা-খারিজ নূতনরূপে দেখা দিল ব'লে আমরা আরবী ও ফার্সী থেকে প্রচুর শব্দ গ্রহণ করেছি। পরবর্তী যুগে ইংরিজি থেকে এবং ইংরিজির মারফতে অন্যান্য ভাষা থেকে নিয়েছি এবং নিচ্ছি।

বিদেশী শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর। নিয়েছি, এবং এখনো সজ্ঞানে আপন খুশীতে নিচ্ছি এবং শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরিজিকে বর্জন করে বাঙলা নেওয়ার পর যে আরো প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ আমাদের ভাষায় ঢুকবে, সে সম্বন্ধেও কারো কোনো সন্দেহ নেই। আলু-কপি আজ রান্নাঘর থেকে তাড়ানো মুশকিল, বিলিতি ওষুধ প্রায় সকলেই খান, ভবিষ্যতে আরো নূতন নূতন ওষুধ খাবেন বলেই মনে হয়। এই দুই বিদেশী বস্তুর ন্যায় আমাদের ভাষাতেও বিদেশী শব্দ থেকে যাবে, নূতন আমদানিও বন্ধ করা যাবে না।

পৃথিবীতে কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অন্তত চেষ্টা করাটা অসম্ভব নাও হতে পারে। হিন্দী উপস্থিত সেই চেষ্টাটা করছেন—বহু সাহিত্যিক উঠে

পড়ে লেগেছেন, হিন্দী থেকে আরবী, ফার্সী এবং ইংরিজি শব্দ তাড়িয়ে দেবার জন্য। চেষ্টাটার ফল আমি হয়তো দেখে যেতে পারবো না; আমার তরুণ পাঠকেরা নিশ্চয়ই দেখে যাবেন। ফল যদি ভালো হয় তখন তাঁরা না হয় চেষ্টা করে দেখবেন। (বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে লিখেছেন, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' নজরুল ইসলাম 'ইন্‌কিলাব',—'ইনক্লাব' নয়—এবং 'শহীদ' শব্দ বাঙলায় ঢুকিয়ে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগর 'সাধু' রচনায় বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতেন না, বেনামীতে লেখা 'অসাধু' রচনায় চুটিয়ে আরবী-ফার্সী ব্যবহার করতেন। আর অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ৺হরপ্রসাদ আরবী-ফার্সী শব্দের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা 'আহাম্মুখী' বলে মনে করতেন। 'আলাল' ও 'হুতোম'-এর ভাষা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল; সাধারণ বাঙলা এ-স্রোতে গা ঢেলে দেবে না ব'লে তার উল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন এবং হিন্দীর বঙ্কিম স্বয়ং প্রেমচন্দ্র হিন্দীতে বিস্তর আরবী-ফার্সী ব্যবহার করেছেন।)

এ স্থলে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। শঙ্করদর্শনের আলোচনায় ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল হবেই, পক্ষান্তরে মোগলাই রেস্তোরাঁর বর্ণনাতে ভাষা অনেকখানি 'হুতোম'-ঘ্যাঁষা হয়ে যেতে বাধ্য। 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় রচনার ভাষা এক—তাতে আছে গাম্ভীর্য, 'বাঁকা চোখের', ভাষা ভিন্ন—তাতে থাকে চটুলতা।

* * *

বাঙলায় যে-সব বিদেশী শব্দ ঢুকেছে তার ভিতরে আরবী, ফার্সী এবং ইংরিজিই প্রধান। সংস্কৃত শব্দ বিদেশী নয় এবং পর্তুগীজ, ফরাসিস, স্পানিশ শব্দ এতই কম যে, সেগুলো নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

বাঙলা ভিন্ন অন্য যে কোনো ভাষার চর্চা আমরা করি না কেন, যে ভাষার শব্দ বাঙলাতে ঢুকবেই। সংস্কৃত চর্চা এ দেশে ছিল ব'লে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ বাঙলায় ঢুকেছে, এখনো আছে ব'লে অল্পবিস্তর ঢুকছে, যতদিন থাকবে ততদিন আরো ঢুকবে ব'লে আশা করতে পারি। ইস্কুল-কলেজ থেকে যে আমরা সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিতে চাইনে তার অন্যতম প্রধান কারণ বাঙলাতে এখনো আমাদের বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন, সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিলে আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব।

ইংরিজির বেলাতেও তাই। বিশেষ ক'রে দর্শন, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের শব্দ আমরা চাই।

রেলের ইঞ্জিন কি ক'রে চালাতে হয়, সে সম্বন্ধে বাঙলাতে কোনো বই আছে ব'লে জানিনে, তাই এ সব টেক্‌নিকল শব্দের প্রয়োজন যে আরো কত বেশী সে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা এখনো আমাদের মধ্যে নেই। সুতরাং ইংরিজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনো আসেনি।

একমাত্র আরবী-ফার্সী শব্দের বেলা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, এই দুই ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নূতন শব্দ বাঙলাতে ঢুকবে না। পশ্চিম বাঙলাতে আরবী-ফার্সীর চর্চা যাবো যাবো করছে, পূব বাঙলায়ও এ সব ভাষার প্রতি তরুণ সম্প্রদায়ের কৌতূহল অতিশয় ক্ষীণ ব'লে তার আয়ু দীর্ঘ হবে ব'লে মনে হয় না এবং শেষ কথা, আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে যে হঠাৎ কোনো অভূতপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়ে বাঙলাকে প্রভাবান্বিত করবে তার সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু যে সব আরবী-ফার্সী শব্দ বাঙলাতে ঢুকে গিয়েছে তার অনেকগুলো যে আমাদের ভাষাতে আরো বহুকাল ধরে চালু থাকবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এবং দ্বিতীয়ত: কোনো কোনো লেখক নূতন বিদেশী শব্দের সন্ধান বর্জন ক'রে পুরনো বাঙলার—'চণ্ডী' থেকে আরম্ভ ক'রে 'হুতোম' পযন্ত—অচলিত আরবী-ফার্সী শব্দ তুলে নিয়ে সেগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পূর্বেও এই এক্সপেরিমেণ্ট করা অতিশয় কঠিন ছিল, কিন্তু অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্য হয়ে পুরনো বাঙলা পড়তে হয়—তারা এই সব শব্দের অনেকগুলো অনায়াসে বুঝতে পারবে ব'লে অচলিত অনেক আরবী-ফার্সী শব্দ নূতন মেয়াদ পাবে।

এই পরিস্থিতির সামনে জীবন্মৃত এ সব শব্দের একটা নূতন খতেন নিলে ভালো হয়।

*　　*　　*

সংস্কৃত, গ্রীক, বাঙলা আর্য ভাষা; আরবী, হীব্রু সেমিতি ভাষা। ফার্সী, উর্দু, কাশ্মীরী, সিন্ধীও আর্য ভাষা, কিন্তু এদের উপর সেমিতি আরবী ভাষা প্রভাব বিস্তার করেছে প্রচুর। উত্তর ভারতের অন্যান্য ভাষাদের মধ্যে বাঙলা এবং গুজরাতিই আরবী ভাষার কাছে ঋণী, কিন্তু এই ঋণের ফলে বাঙলার মূল সুর বদলায়নি। গুজরাতির বেলাও তাই।

হীব্রু এবং আরবী সাহিত্যের ঐশ্বর্য সর্বজনবিদিত। ঠিক সেই রকম প্রাচীন আর্য ভাষা ফার্সী তার ভগ্নী সংস্কৃতের ন্যায় খৃষ্টের জন্মের পূর্বেই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। আরবরা যখন ইরান জয় করে তখন তারা ইরানীদের তুলনায় সভ্যতা

সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ। কিন্তু তারা সঙ্গে আনলো যে ধর্ম সেটি জরথুস্ত্রী ধর্মের চেয়ে প্রগতিশীল, সর্বজনীন এবং দুঃখীর বেদনা উপশমকারী। ফলে তাবৎ ইরান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো এবং আপন ভাষা ও সাহিত্য বর্জন করে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা ও সংস্কৃতির বাহনরূপে স্বীকার করে নিল। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাই ইরানীদের দান অতুলনীয়।

চারশত বৎসর পরে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হল। ইরানীদের আপন ভাষা তখন মাহমূদ বাদশার উৎসাহে নবজন্ম লাভ ক'রে নব নব সাহিত্য-সৃষ্টির পথে এগিয়ে চললো। বাল্মীকি যে রকম আদি এবং বিশ্বজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, ফিরদৌসীও এই নব ইরানী (ফার্সী) ভাষার আদি এবং শ্রেষ্ঠ কবি। আরবী থেকে শব্দ এবং ভাবসম্পদ গ্রহণ করে ফার্সী সাহিত্য যে অভূতপূর্ব বিচিত্র রূপ ধারণ করলো তা আজও বিশ্বজনের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। রূমী, হাফিজ, সাদী, খৈয়াম আপন আপন রশ্মিমণ্ডলে সবিতাস্বরূপ। সেমিতি আরবী এবং আর্য ফার্সী ভাষার সংঘর্ষের ফলেই এই অনির্বাণ হোমানলের সৃষ্টি হল।

পরবর্তী যুগে এই ফার্সী সাহিত্যই উত্তর ভারতে ব্যাপকরূপে প্রভাব বিস্তার করলো। ভারতীয় মক্তব-মাদ্রাসায় যদিও প্রচুর পরিমাণে আরবী ভাষা পড়ানো হয়েছিল তবু কার্যত দেখা গেল ভারতীয় আর্যগণ ইরানী আর্য সাহিত্য অর্থাৎ ফার্সীর সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন বেশী। উর্দু সাহিত্যের মূল স্বর তাই ফার্সীর সঙ্গে বাঁধা--আরবীদের সঙ্গে নয়। হিন্দী গদ্যের উপরও বাইরের প্রভাব পড়েছে সেটা ফার্সী—আরবী নয়।

একদা ইরানে যে রকম আর্য ইরানী ভাষা ও সেমিতি আরবী ভাষার সংঘর্ষে নবীন ফার্সী জন্ম গ্রহণ করেছিল, ভারতবর্ষে সেই সংঘর্ষের ফলে সিন্ধী, উর্দু ও কাশ্মীরী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আরবীর এই সংঘর্ষ ফার্সীর মাধ্যমে ঘটেছিল বলে কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, ভারতবর্ষীয় এ তিন ভাষা ফার্সীর মত নব নব সৃষ্টি দিয়ে ঐশ্বর্যশালী সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারলো না। উর্দুতে কবি ইকবালই এ তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ও নূতন সৃষ্টির চেষ্টা করে উর্দুকে ফার্সীর অনুকরণ থেকে কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

* * *

বাঙলা আর্যভূমি, কিন্তু এ ভূমির আর্যগণ উত্তর ভারতের অন্যান্য আর্যের মত নন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এখানে নয়। তাই মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) বাঙলাদেশকে যখনই বাইরের কোনো শক্তি শাসন করতে চেষ্টা করেছে তখনই বাঙালী বিদ্রোহ করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপন স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাঠান যুগে বাঙলা অতি অল্পকাল পরাধীন ছিল এবং মুঘল যুগেও মোটামুটি মাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙজেব পর্যন্ত বাঙলা দিল্লীর শাসন মেনেছে।

(২) অন্যান্য আর্যদের তুলনায় বাঙালী কিছুমাত্র কম সংস্কৃত চর্চা করেনি, কিন্তু সে-চর্চা সে করেছে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। আদিশূর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর. সকলের বহু চেষ্টাতেও বাঙালী উত্তর ভারতের সঙ্গে স্ট্রীমলাইন্‌ড্ হয়ে সংস্কৃত পদ্ধতিতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ করেনি এবং বাঙলাতে সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করার সময় তো কথাই নেই।

(৩) বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলী কীর্তনে। এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালী। এ সাহিত্যে শুধু যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাঙলায় খাঁটি কানুরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী শ্রীরাধাও যে একেবারে খাঁটি বাঙালী মেয়ে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুর্শীদায়ার আশিক ও পদাবলীর শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

বাঙালীর চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান। তার অর্থ এই যে, কি রাজনীতি, কি ধর্ম, কি সাহিত্য. যখনই যেখানে সে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে; এবং তখন কেউ 'গতানুগতিক পন্থা' 'প্রাচীন ঐতিহ্য'-এর দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা.—যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।

এ বিদ্রোহ বাঙালী হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালী মুসলমানও এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।

* * *

পাঠান আমলে বাঙলাদেশে আরবী-ফার্সীর চর্চা ব্যাপকভাবে হয়নি। সে-যুগে বাঙলাতে লিখিত সরকারী দলিলপত্রে পর্যন্ত আরবী-ফার্সী টেক্‌নিকল শব্দ প্রায় নেই। মহাপ্রভু এবং তাঁর শিষ্যদের কেউ কেউ মুসলমান ধর্মের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সে যুগের বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ অতি অল্প।

খাস পাঠান যুগে তো কথাই নেই, মোগল যুগের প্রারম্ভেও কবি আলাওল যে বাক্য রচনা করেছেন তাতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যই লক্ষণীয়—

উপনীত হৈল আসি যৌবনের কাল।
কিঞ্চিৎ ভুরুর-ভঙ্গে যৌবন রসাল॥
আড় আঁখি বঙ্ক-দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু যেন শিহরয়॥
সম্বরয় গিম হার, কটির বসন।
চঞ্চল হইল আঁখি, ধৈর্য-গমন॥
চোররূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে আসে যায়।
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে ভায়॥

এ ধরনের কাব্য তখন মুসলমানদের ভিতর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বর্ণনা পাই অন্য এক কবির কাছ থেকে। সৈয়দ সুলতান বলেন,

আপনা দীনের বোল্ এক না বুঝিল।
পরস্তব সকল লৈয়া সব রহিল॥

(দীন=ধর্ম; পরস্তব=পরধর্ম কীর্তন। এর পূর্বেই মুসলমানরা পদাবলী কীর্তন রচনা আরম্ভ করেছেন এবং কাজী ফয়জউল্লার 'গোরক্ষবিজয়' মুসলমানদের ভিতর লোকপ্রিয় হয়ে গিয়েছে।)

মুসলমানরা আপন ধর্মচর্চা না করে 'হিন্দুয়ানী' কাব্য নিয়ে মেতে আছে দেখে মুসলমান মোল্লা-মৌলবীগণ তারস্বরে আপন প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং আরবী-ফার্সীতে ধর্মচর্চা করবার জন্য বার বার কড়া ফতোয়া জারী করেছেন।

তখন সৈয়দ সুলতান বললেন, 'আমরা বাঙলা ছাড়বো না; কিন্তু মুসলমান শাস্ত্রচর্চাও করবো। তাই বাঙলাতেই মুসলমান শাস্ত্রচর্চা হবে।

আরবী-ফার্সী ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে, না বুঝে মূর্খসুত॥
যে সবে আপন বুলি না পারে বুঝিতে।
পাঁচালি রচিলাম করি আছয়ে দূষিতে॥
আল্লায় বলিছে, 'মুই যে-দেশে যে-ভাষ,
সে-দেশে সে-ভাষে কইলুম রসূল প্রকাশ॥'

(আলিমান=আলিমগণ=পণ্ডিতগণ; রসূল=আল্লার প্রেরিত পুরুষ, পয়গম্বর।)

অতি মোক্ষম জবাব। সৈয়দ সুলতান কুরানের বচন উদ্ধৃত করে সপ্রমাণ করলেন, বাঙলাতেই বাঙালী মুসলমানের শাস্ত্রচর্চা করা ফরজ—অবশ্য করণীয়।

সৈয়দ সুলতান কিন্তু আটঘাট বেঁধে পয়গম্বর সাহেবের বাণী বাঙলাতে প্রকাশ করেছেন। নিতান্ত যে কটি আরবী শব্দ ব্যবহার না করলেই নয়, তিনি মাত্র সেগুলোই ব্যবহার করেছেন এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মাধ্যমেই ইসলাম প্রকাশ করেছেন।

তোমার সবের মুই জানো হিতকারী।
ইমান-ইসলামের কথা দিলাম প্রচারি॥
যেরূপে সৃজন হইল সুরাসুরগণ।
যেরূপে সৃজন হইল এ তিন ভুবন॥
যেরূপে আদম ইবা সৃজন হইল।
যেরূপে যতেক পয়গম্বর উপজিল॥
বঙ্গেতে এসব কথা কেহ না জানিল।
নবী-বংশ পাঁচালীতে সকল শুনিল॥

এ-স্থলে দ্রষ্টব্য, হিন্দু মুসলমান উভয়কে মুসলমান ধর্ম বোঝাতে গিয়ে কবি এমন সব বস্তু উল্লেখ করেছেন, যা মুসলমান ধর্মে নেই। 'সুর' 'অসুর' কল্পনা ইসলামে নেই। 'তিন ভুবন' ইসলামে নেই, আছে 'দুই ভুবন'। তাঁর পুস্তকের নাম 'নবীবংশ' ও হিন্দু 'হরিবংশের' অনুকরণ—আরবীতে এই ধরনের নাম নেই।

এমন কি তিনি পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদকে 'অবতার' আখ্যা দিয়ে মোল্লাদের মতে পাপ করেছেন; কারণ মুসলিম শাস্ত্রমতে আল্লা মনুষ্যদেহ গ্রহণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না, তিনি মনুষ্যদের একজনকে বেছে তাঁকে তাঁর মুখপাত্র করেন। সৈয়দ সুলতান কিন্তু বলছেন,

মুহম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিল হইতে প্রচার॥

আর সব চেয়ে বড় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন সৈয়দ সাহেব, এই দুইটি ছত্রে—

যারে যেই ভাবে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা তাহার, অমূল্য সেই ধন॥

এই দু'টি ছত্রে যে কত বড় সত্য নিহিত আছে, সে তত্ত্ব কি আমরা আজও বুঝতে পেরেছি? এই সৈয়দ সুলতানকে তখনকার দিনের মোল্লা-মৌলবীরা 'ইসলামের ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে', 'আরবীর মর্যাদা লোপ পাবে' এই সব ভয় দেখিয়ে

শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'মুনাফিক' অর্থাৎ 'ভণ্ড' অর্থাৎ ধর্মধ্বংসকারী' আখ্যা দিয়ে 'ফতোয়া' পর্যন্ত জারী করেছেন। সাহসী কবি কিন্তু অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁর মাতৃভাষা বাঙলার জয়গান গেয়ে গেছেন। এ লোক যদি প্রকৃত বাঙালী না হয়, তবে বাঙালী কে ?

সে শুভবুদ্ধি, সে সাহস কি আজও আমাদের হয়েছে ? কেউ বলে 'রাষ্ট্রের অখণ্ডতার জন্য হিন্দী গ্রহণ করো', কেউ বলে 'ইংরিজি বর্জন করলে আমরা বর্বর হয়ে যাব।' হায়, বাঙলার পদমর্যাদা কেউ স্বীকার করে না।

যখন দ্বন্দ্ব নেই, সংঘাত নেই, তখন মাতৃভাষার গৌরবগান গেয়ে লম্ফ-ঝম্প করে সবাই ; কিন্তু যুগসন্ধিক্ষণে, নানা প্রলোভন-বিভীষিকার সম্মুখে মাতৃভাষাকে নিজের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলতে পারাতেই প্রকৃত সাহস, প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির লক্ষণ। সৈয়দ সুলতানের দুইশত বৎসর পরে ইংরিজি ভাষা বাঙালীকে প্রলোভন দেখিয়েছিল আরেকবার। কিন্তু মুসলমান সুলতানের ন্যায় খৃষ্টান মাইকেল তখন উচ্চকণ্ঠে বাঙলার জয়গান গেয়েছিলেন।

সৈয়দ সুলতানের অনুকরণকারীরা কিন্তু তাঁর মত বিচক্ষণ ভাষাবিদ ছিলেন না : ফলে বাঙলাতে যে পরিমাণে আরবী-ফার্সী শব্দ প্রবেশ করতে লাগল তাতে ভাষার বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হতে লাগল। ইতিমধ্যে—মোগল যুগের শেষের দিকে—উর্দু ভাষাও বাঙলাদেশে প্রবেশ করেছে। তাই তখন যে বাঙলা পাচ্ছি তার উদাহরণ—

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা।
দুনিয়ামে এসাভি আদমী রহে সাঁচা॥
ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাছে।
রাতদিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে॥
জানা গেল বাত বাওয়া জানা গেল বাত।
কাপড়া লেও আওর আও মেরা সাথ॥

যুক্তি নয়, অজুহাত হিসেবে বলা যেতে পারে, আকবরের আমল থেকে বহুল ফার্সী শিক্ষাদানের ফলে বাঙলাদেশে তখন প্রচুর লোক বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। এটা কিন্তু কোনো সংযুক্তি নয়। কারণ আজ আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিস্তর ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করি : তাই বলে সাহিত্যসৃষ্টির সময় বে-এক্তেয়ার হয়ে যত্র-তত্র ভূরি ভূরি ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করিনে।

কিন্তু সত্য কবি পথভ্রষ্ট হন না। তার প্রকৃত নিদর্শন আমরা পাই, চট্টগ্রামের মহিলা কবি 'শ্রীমতী রহীম্মুনিসার' (আশা করি 'শ্রীমতী' লেখাতে কেউ আপত্তি করবেন না, কারণ তিনি নিজেই তাঁর কাব্যে আপন পরিচয় দেবার সময় লিখেছেন—

"স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লিখি এ-ভারতী।
রহিমুনিচা নাম জান আম্বে ছিরীমতী॥")

এক মহিলা কবির সঙ্গে হালে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ববঙ্গের বাঙলা-একাডেমির প্রথম ডাইরেক্টর (বাঙলা-একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩, পৃ ৫৩)। তাঁর মতে '১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই রহীমু-'ন্-নিসা আবির্ভূ'তা হয়েছিলেন।' ইনিও সৈয়দ সুলতানের মত সৈয়দ বংশের মেয়ে এবং পরিবারে প্রচুর আরবী-ফার্সীর চর্চা থাকা সত্ত্বেও সুস্থ, সরল এবং মধুর বাঙলায় কবিতা রচনা করে গিয়েছেন।

এঁর হাতের-লেখা খুব সম্ভব সুন্দর ছিল। তাই বোধ করি তাঁর স্বামী তাঁকে কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' নকল করতে আদেশ দেন : -

শুন গুনিগণ হই এক মন,
লেখিকার নিবেদন।
অক্ষর পড়িলে টুটা পদ হৈলে
শুধারিঅ সর্ব্বজন॥
পদ এই রাষ্ট্র হেন মহাকষ্ট
পুঁথি সতী পদ্মাবতী।
আলাওল মণি, বুদ্ধি বলে গুণী,
বিরচিল এ ভারতী॥
পদের উকতি বুঝি কি শকতি,
মুই হীন তিরী জাতি।
স্বামীর আদেশ মানিয়া বিশেষ
সাহস করিল গাঁথি॥

রহীমুন্নিসার স্বরচিত কাব্য অল্পই পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে তাঁর একটি 'বারমাস্যা' বড়ই করুণ এবং মধুর। পূর্ববঙ্গের কবিরা সচরাচর প্রিয় বিরহে বারমাস্যা রচনা করেছেন—রহীমুন্নিসা ভ্রাতৃশোকে তাঁর নব বারমাস্যা রচনা করেছেন।

আশ্বিনেতে খোয়াময়   কান্দে তরুলতাচয়
ভাই বলি কান্দে উভরায়।
আমার কান্দনি শুনি   বনে কান্দে কুরঙ্গিণী
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায়॥
(খোয়া = কুয়াশা)

অন্য এক স্থলে 'কন্যাহারা জননী'র শোকাতুরার ক্রন্দন প্রকাশ করেছেন অতুলনীয় সরল বাঙলায় —

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার
মোর জাদু গেল ফিরি না আসিল আর॥

এঁর রচনায় সত্যই মধুর কবি-প্রতিভা 'বারেবার' ধরা পড়ে। পাঠককে মূল প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ জানাই।

*   *   *   *

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ ইংরিজির সঙ্গে। এবং সেই দ্বন্দ্ব বিদ্রোহরূপ ধারণ করলো পূর্ব বাঙালার ভাষা আন্দোলনে ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে। বাঙলা আবার জয়ী হল—কিন্তু এবারে তার জয়মূল্য দিতে হল বুকের রক্ত দিয়ে—কিন্তু আব্রু, ইজ্জৎ, ইমান দিয়ে নয়। পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও পূব বাঙলার লোক বাঙলাতে আরেক দফে আরবী-ফার্সী শব্দ আমদানি করে ভাষাকে 'পাক' করতে প্রলোভিত হল না।

তাই এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছি 'মাম্‌দোর' পুনর্জন্ম। 'মাম্‌দোর'ই যখন কোন অস্তিত্ব নেই, তখন তার পুনর্জন্ম হবে কি প্রকারে? পূব বাঙলার লেখকদের স্কন্ধে আরবী-ফার্সী শব্দের মামদো ভর করবে, আর তারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আরবী-ফার্সীতে অর্থাৎ 'যাবনী মিশালে' কিচিরমিচির করতে আরম্ভ করবে, বিজাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করবে—যার মাথামুণ্ডু পশ্চিম বাঙলার লোক বুঝতে পারবে না, সে ভয় 'স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম'॥

১৩৬৩

দিল্লী স্থাপত্য

যাঁরা এই শীতে প্রথম দিল্লী যাচ্ছেন কিংবা যাঁরা পূর্বে গিয়েছেন কিন্তু পাঠান-মোগলের দালান-কোঠা, এমারত-দৌলত দেখবার সুযোগ ভালো করে পাননি, এ-লেখাটি তাঁদের জন্য। এবং বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁদের স্থাপত্য দেখে অভ্যাস নেই বলে ঐ রস থেকে বঞ্চিত। লেখাটিতে কিঞ্চিৎ 'মাস্টারি মাস্টারি' ভাব থেকে যাবে বলে গুণিজনকে আগের থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তাঁরা যেন এটি না পড়েন।

কোনো-কালে যে ব্যক্তি গান শোনেনি সে যদি হঠাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য না করে তা হলে চট করে তাকে বেরসিক বলা অন্যায়। বাঙলা দেশে এখানে-ওখানে ছিটেফোঁটা স্থাপত্য আছে বটে, কিন্তু একই জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বলে স্থাপত্যের যে ক্রমবিকাশ এবং সামগ্রিক রূপ তার রস বুঝতে সাহায্য করে তার সম্পূর্ণ অভাব। বিচ্ছিন্নভাবে যে বিশেষ একটি মন্দির, মসজিদ বা সমাধি রসসৃষ্টি করতে পারে না, তা নয়। তাই তুলনা দিয়ে বলতে পারি, জগতের কোনো সাহিত্যের সঙ্গে যদি আপনার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকে, তবে সাধারণত ধরে নেওয়া যেতে পারে যে উটকো একখানা ফরাসী উপন্যাসের রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। রসবোধের জন্য ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ-জ্ঞান অপরিহার্য কিনা এ প্রশ্ন নন্দনশাস্ত্রের অন্যতম কঠিন প্রশ্ন। সে গোলকধাঁধার ভিতর একবার ঢুকলে আর দিল্লী যাবার পথ পাবেন না, আর 'দিল্লী দূর অস্ত্' তো বটেই।

কবিতা, সঙ্গীত, স্থাপত্য ভাস্কর্যের মূল রস একই—ইংরিজেতে যাকে বলে ইসথেটিক ডিলাইট। কিন্তু এক রসের চিন্ময়রূপ (যথা কাব্যের) যদি অন্য রসের মৃন্ময়রূপে (যথা ভাস্কর্য, স্থাপত্যে) টায় টায় মিলছে না দেখেন তবে আশ্চর্য হবেন না। এদের প্রত্যেকেই মূল রস প্রকাশ করে আপন আপন 'ভাষায়', নিজস্ব শৈলীতে এবং আঙ্গিকে। একবার সেটি ধরতে পারলেই আর কোনো ভাবনা

নেই। তার পর নিজের থেকেই আপনার গায়ে রসবোধের নূতন নূতন পাখা গজাতে থাকবে, আপনি উড়তে উড়তে হঠাৎ দেখবেন তাজমহলের গম্বুজটিও আপনার সঙ্গে আকাশ পানে ধাওয়া করেছে—নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেন ক্রমেই পাতালের দিকে ডুবে যাচ্ছে।

স্থাপত্যের প্রধান রস—প্রধান কেন, একমাত্র বললেও ভুল বলা হয় না, অন্যগুলো থাকলে ভালো, না থাকলে আপত্তি নেই—তার কম্পজিশনে, অর্থাৎ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন ধরুন, গম্বুজ, মিনার, আর্চ (দেউড়ি), ছত্রি (কিয়োস্‌ক্, পেভিলিয়ন), ভিত্তি এমনভাবে সাজানো যে দেখে আপনার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, সঙ্গীতেও তাই। কয়েকটি স্বর—সা, রে, গা, মা, ইত্যাদি এমনভাবে সাজানো হয় যে শোনামাত্রই আপনার মন এক অনির্বচনীয় রসে আপ্লুত হয়।

এই সামঞ্জস্য যখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তখনই স্থাপত্য সার্থক। এবং স্থাপত্যের এই অনিন্দ্য সামঞ্জস্য যদি কাব্যে কিংবা উপন্যাসে পাওয়া যায় তবে বলা হয়, কাব্যখানিতে আরকিটেক্‌টনিকাল্ মহিমা আছে—মহাভারতে আছে, ফাউস্টে আছে এবং উয়োর অ্যাণ্ড পীসে আছে; জঁ্যা ক্রিস্তফ উত্তম উপন্যাস কিন্তু এ-গুণটি সেখানে অনুপস্থিত। লিরিক বা গীতিকাব্যে যদিও কম্পজিশন থাকে—তা সে যতই কম হ'ক না কেন—তাতে আরকিটেক্‌টনিকাল্ বৈশিষ্ট্য থাকে না।[১]

স্থাপত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তারপর গুণীরা বলেন, এবং সার্থক স্থাপত্যে স্থপতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর নিঁখুত সামঞ্জস্য করার পর সেগুলোকে অলঙ্কার সহযোগে সুন্দর করে তোলেন। অধম একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। কিন্তু এ গোলক-ধাঁধায়ও সে ঢুকতে নারাজ। দিল্লীর দিওয়ান-ই-খাস ও দিওয়ান-ই-আমে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, তুগলুক যুগের স্থাপত্যে অলঙ্কার প্রায় নেই—পাঠক দিল্লী দেখার সময় এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।[২] অথচ দুইই সার্থক রসসৃষ্টি।

এই সামঞ্জস্য যদি খাড়াই চওড়াই—অর্থাৎ মাত্র দুই দিক—নিয়ে হয় তবে সেটা

(১) 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গানটি সার্থক, এবং এই নীতির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

(২) 'তুলসীর মূলে যেন সুবর্ণ দেউটি উজলিল দশ দিক—' এবং 'পিকবর-রব নব-পল্লব মাঝারে' দুটিই সার্থক। প্রথমটিতে অলঙ্কার নেই। অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি হলে কাব্য দুর্বল হয়ে পড়ে। মেঘদূতের তুলনায় যে রকম গীত-গোবিন্দ।

ছবি। শুধু সামনের দিক থেকে দেখা যায়। তিন দিক নিয়ে—তিন ডাইমেনশনাল—হলে সেটা ভাস্কর্য কিংবা স্থাপত্য। কিন্তু অনেক সময় মূর্তির পিছন দিকটা অবহেলা করা হয় বলে সেটাকে শুধু সামনের দিক থেকে দেখতে হয়। গড়ের মাঠের যে সব মূর্তি ঘোড়-সওয়ার নয় সেগুলো পিছন থেকে দেখতে রীতিমত খারাপ লাগে (বস্তুত এই সমস্যা সমাধানের জন্যই অনেক নিরীহ লোককে ঘোড়ায় চড়ানো হয়েছে) এবং বাস্‌ট্‌গুলো পিছন থেকে রীতিমত কদাকার বলে সেগুলোকে দেওয়ালের গায়ে ঠেলে দেওয়া হয়—যাতে করে পিছন থেকে দেখবার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি জলের কাছে রয়েছে বলেই ঐ সমস্যাটির সমাধান হয়েছে—জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে মূর্তির পিছন দিকে তাকাবে ক'জন লোক ?

কিন্তু স্থাপত্যের বেলা সেটি হবার জো নেই। স্থাপত্য এমন হবে যে সেটাকে যেন সব দিক থেকে এবং বিশেষ করে যে-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। কোনো জায়গা থেকে যদি, ধরুন, মনে হয়, দুটো মিনার এক হয়ে গিয়ে কেমন যেন দেউড়িটাকে ঢেকে অপ্রিয়দর্শন করে তুলেছে তবে বুঝবেন স্থপতি আর্টের কোনো একটা সমস্যার ঠিক সমাধান করতে পারেননি বলেই এ-স্থলে তাল কেটেছেন, অর্থাৎ রসভঙ্গ করেছেন।

ঠিক এই কারণে, মসজিদ মাত্রেরই একটা মুশ্‌কিল থেকে যায়। শাস্ত্রের হুকুম মসজিদের পশ্চিম দিক যেন বন্ধ থাকে, যাতে করে নমাজীদের সামনে কোনো বস্তু তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ না করতে পারে। ফলে বাধ্য হয়ে স্থপতিকে পশ্চিম দিকে দিতে হয় খাড়া পাঁচিল। এটার সঙ্গে আর বাদ-বাকি তিন দিক কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না বলে, মসজিদ শুধু তিন দিক থেকে দেখা যায়। ধর্মতলার টিপ্‌পু স্থলতানের মসজিদ কিছু উত্তম রসসৃষ্টি নয়—দক্ষিণী ঢঙের গম্বুজগুলোই যা দেখবার মতো—কিন্তু পাঠক সেটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলেই সমস্যাটা বুঝে যাবেন। দিল্লীর পুরনো মসজিদে-মসজিদে পাঠক দেখবেন, স্থপতি কত রকম চেষ্টা করেছেন এই সমস্যা সমাধানের।

সমাধি, রাজপ্রাসাদ, বিজয়স্তম্ভ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোনো বাধাবন্ধক নেই। তাই সেগুলোতে এ অপরিপূর্ণতা থাকা মারাত্মক। সচরাচর থাকেও না।

পূর্বেই নিবেদন করেছি সার্থক স্থাপত্য যে-কোনো জায়গাতে, যে-কোনো দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখা যায়। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে, সব চেয়ে ভালো কোন্ জায়গা থেকে দেখা যায় ? উচ্চাঙ্গ মোগল স্থাপত্যমাত্রেই স্থপতি এর নির্দেশ নিজেই দিয়ে

গিয়েছেন। স্থাপত্যে পৌঁছবার বেশ কিছুটা আগে যে প্রধান তোরণদ্বার (দেউড়ি গেট-ওয়ে) থাকে—এরই উপর নহবৎখানা তার ঠিক নীচে দাঁড়ালেই স্থাপত্যের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। সাধারণত ছবি এ-জায়গা থেকেই ভালো ওঠে। আর যদি নিজের রসবোধ তার সঙ্গে সংযোজন করতে চান, তবে একটু পিছিয়ে গিয়ে দেউড়ির আর্চসুদ্ধ ছবি তুললে তাতে 'ঈসথেটিক ইফেক্‌ট' আসবে—যদিও মূল স্থাপত্যের কিছুটা হয়ত তাতে করে কাটা পড়বে।

এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু আমার মনে হয় স্থাপত্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ সে আলোচনা তোলাই সঙ্গত।

* * * *

দিল্লীর স্থাপত্য তার রাজবংশানুযায়ী ভাগ করা যায়।

॥ ১ ॥ দাস বংশ

কুৎব্ মিনার, কুওওতুল-ইসলাম মসজিদ, ইলতুতমিশের সমাধি। (কুওওতুল-ইসলাম মসজিদের আঙ্গিনায়—সেহ্‌নে—চন্দ্ররাজা নির্মিত একটি শতকরা নিরনব্বই ভাগের লৌহস্তম্ভ আছে। এটি ও মসজিদের থামগুলো হিন্দুযুগের।)—সবকটি কুৎবের গা ঘেঁষে।

॥ ২ ॥ খিলজী-বংশ

আলাউদ্দীন খিলজী নির্মিত 'আলা-ই দরওয়াজা'—কুৎবের গা ঘেঁষে। আলাউদ্দীন কিংবা তাঁর ছেলের ('দেবলা-দেবীর' বল্লভ) তৈরী মসজিদ—দিল্লী-মথুরা ট্রাঙ্ক রোডের উপর (নিউ দিল্লী থেকে মাইল খানেক) নিজামউদ্দীন আউলিয়ার[১] দরগার ভিতর[২]।

॥ ৩ ॥ তুগলুক-বংশ

গিয়াসউদ্দীন তুগলুক[৩] নির্মিত আপন সমাধি—কুৎব থেকে মাইল তিনেক দূরে তাঁর-ই নির্মিত তুগলুকাবাদের সামনে। তুগল্‌কাবাদ।

---

(১), (৩) 'দৃষ্টিপাতে' উল্লিখিত 'দিল্লী দূর অস্ত্' কাহিনীর নায়কদ্বয়। গিয়াসের ছেলে 'পাগলা' রাজা মুহম্মদ তুগলুকের তৈরী 'আদিলাবাদ'-এর ভগ্নাবশেষে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। মুহম্মদ এবং নিজামউদ্দীনের মিত্র কবি-সম্রাট আমির খুসরৌ ('দেবলা-দেবীর' প্রেমের কাহিনী ইনিই প্রথম ফার্সীতে লেখেন) এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীর কবর নিজামউদ্দীনের দরগার ভিতর।

(২) ইলতুতমিশের কন্যা সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার যে কবর দিল্লীতে আছে সেটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন।

ফিরোজ তুগলুক নির্মিত হাউজ খাস—দিল্লী থেকে কুৎব যাবার পথে রাস্তার ডান দিকে। ফিরোজ নির্মিত ফিরোজশাহ-কোট্‌লা,—দিল্লী এবং নয়াদিল্লীর প্রায় মাঝখানে (অন্যান্য দ্রষ্টব্যের ভিতর এখানে আছে একটি অশোকস্তম্ভ ; ফিরোজ এটাকে দিল্লীতে আনিয়ে উঁচু ইমারৎ বানিয়ে তার উপরে চড়ান)।

॥ ৪ ॥ সৈয়দ এবং লোদীবংশ

লোদী গার্ডেন্‌স্‌—নয়াদিল্লীর লোদী এস্‌টেটের গা ঘেঁষে—ভিতরে আছে, (ক) মুহম্মদ শাহ সৈয়দের কবর, (খ) সিকন্দর লোদীর তৈরী মসজিদ এবং মসজিদের প্রবেশগৃহ, (গ) অজানা কবর এবং (ঘ) সিকন্দর লোদীর কবর।

ইসা খানের কবর—হুমায়ুনের কবরের বাইরে। যদিও পরবর্তী যুগের, তবু লোদীশৈলীতে তৈরী।

॥ ৫ ॥ মোগল-বংশ

বাবুর কিছু তৈরী করার সময় পাননি। কেউ কেউ বলেন, পালম এ্যার-পোর্টের সামনে যে দুর্গের মতো সরাই এটি তাঁর হুকুমে তৈরী। এতে দ্রষ্টব্য কিছুই নেই।

হুমায়ুনও এক 'পুরানা কিলা' (ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের পিছনে) ছাড়া কিছু করে যেতে পারেননি। পুরনো কেল্লারও কতখানি তাঁর, কতখানি শের শা'র, বলা শক্ত। কেল্লার ভিতরে মসজিদটি কিন্তু শের শা'র তৈরী এবং এর শৈলী পাঠান মোগল থেকে ভিন্ন। (সাসরামে শেরের কবর সৈয়দ-লোদী শৈলীতে)।

হুমায়ুনের বিধবার—আকবরের মাতার—তৈরী হুমায়ুনের কবর। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগার সামনে, দিল্লী-মথুরা রোডের ওপাশে।

আকবরের কীর্তি-কলা আগ্রাতে—সেকেন্দ্রা, ফতহ্‌পুর সিক্রী, আগ্রা দুর্গ। ঐ সময়ে তৈরী দিল্লীতে আছে আৎকা খান, আজিজ কোকলতাশ, আব্দুর রহীম খান খানা ও আদ্‌হম্‌ খানের কবর।

শাহজাহান—দিল্লী দুর্গ বা লাল কিলা। তার-ই সামনে চাঁদনী চৌকের কাছে জাম-ই মসজিদ।

ঔরঙ্গজেব—লাল কিলার ভিতর মোতী মসজিদ।

ঔরঙ্গজেবের ভগ্নী রৌশনারার নিজের তৈরী সমাধি—রৌশনারা-গার্ডেন্‌সের ভিতর।

ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন, ঔরঙ্গজেবের পরের বাদশাদের অর্থ ও প্রভাব

দুই-ই কম ছিল বলে এঁরা প্রায় কিছুই করে যেতে পারেননি। যেটুকু আছে তাতে আলঙ্কারিক সৌন্দর্য যথেষ্ট বটে, কিন্তু স্থাপত্যের লক্ষণ প্রায় নেই—স্থপতি সে-চেষ্টা করেনও নি। এর ভিতর উল্লেখযোগ্য জাহানারা, মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলা, এবং দ্বিতীয় আকবরের (ইনি রাজা রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন) কবর। তিনটিই নিজামউদ্‌দীনের দরগার ভিতরে। মোগল স্থাপত্যের 'শেষ নিশ্বাস' সফদর্-জঙ্গের সমাধিও তৎসংলগ্ন মসজিদ—কুলোকে বলে এটার মার্বেল আব্দুর রহীম খান খানার কবর থেকে চুরি করা ইমারৎটি যদিও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তবু তার সৌন্দর্য নিম্নশ্রেণীর, রুচির বিলক্ষণ অধোগতি এতে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ছবিতে হুমায়ুনের কবর, তাজমহল, এমনকি আৎকা খানের ছোট কবরটির সঙ্গে তুলনা করলেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। আৎকা খানের কবরটি আমার বড় প্রিয় স্থাপত্য। দিল্লীর লোক এ-কবরটির খবর রাখে না, কারণ এটি নিজামউদ্‌দীন দরগার এক নিভৃত কোণে পড়ে আছে।

দিল্লীতে তিনটি বড় দরগা আছে। প্রথমটি কুৎবউদ্‌দীন বখতিয়ার কাকীর। ইনি কুৎব্‌উদ্‌দীন আইবকের গুরু ছিলেন। অনেকের ধারণা আইবক গুরুর স্মরণে কুৎব মিনার নির্মাণ করেছিলেন। দরগাটি কুৎব মিনারের কাছেই এবং 'কুৎব-সাহেব' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়টি নিজামউদ্‌দীন আউলিয়ার এবং তৃতীয়টি নাসিরউদ্‌দীন 'চিরাগ দিল্লী'র। দরগাটি দিল্লী থেকে মাইল তিনেক দূরে।

প্রথমটির পত্তন দাস আমলে, দ্বিতীয়টির খিলজী আমলে এবং তৃতীয়টির তুগলুক আমলে। সেই যুগ থেকে শেষ-মোগল পর্যন্ত এসব দরগাতে বহু ভক্ত নানা ইমারত গড়েছেন বলে অল্পের ভিতর সব স্থাপত্যেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চোখ কিছুটা না বসা পর্যন্ত এসব জায়গায় গবেষণা করা বিপজ্জনক।

কুৎব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার। ইংরেজ পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছে। আশ্চর্য মনে হয় যে, এর পূর্ববর্তী নিদর্শন এদেশে নেই, ইরান-তুরানেও নেই। বহু স্থপতির বহু এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের সম্পূর্ণ ফায়দা উঠিয়ে তাজ নির্মিত হল—কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কুৎব্ প্রথম এবং শেষ এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট। এ ধরনের বিজয়স্তম্ভ পূর্বে কেউ করেনি; কাজেই গুণিজনের বিস্ময়ের অবধি নেই যে, হঠাৎ স্থপতি এ সাহস পেল কোথা থেকে? কানিংহাম ফার্গুসন, কার স্টিফেন, স্তর সৈয়দ আহমদ অনেক ভেবে চিন্তেও এর কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

কুৎব্ পাঁচতলার মিনার। প্রথম তলাতে আছে 'বাঁশী' ও 'কোণের' পর-পর সাজানো নকশা। দ্বিতীয় তলাতে শুধু বাঁশী, তৃতীয় তলাতে শুধু কোণ। চতুর্থ ও পঞ্চম তলাতে কি ছিল জানার উপায় নেই, কারণ বজ্রাঘাতে সে দুটি ভেঙে যাওয়ায় ফিরোজ তুগলুক (যিনি 'অশোক স্তম্ভ' দিল্লী আনেন ; ইনি যেমন নিজে সোৎসাহে ইমারত বানাতেন ঠিক তেমনি অকাতরে অন্যের ইমারত মেরামৎ করে দিতেন—দিল্লীর অতি অল্প রাজাতেই এই দ্বিতীয় গুণটি পাওয়া যায়) সে দুটি মার্বল দিয়ে মেরামৎ করে দেন। পঞ্চমটিতে নাকি আবার সিকন্দর লোদীরও হাত আছে। মিনারের মুকুটরূপে সর্বশেষ (যেখানে এখন আলো জ্বালানো হয়) কি ছিল সে সম্বন্ধে রসিকজনের কৌতূহলের অন্ত নেই।[১] দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা মিনারকে স্থপতি কি রাজমুকুট পরিয়েছিলেন—সেখানেও তিনি তাল রেখে শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা, তাঁর যে অদ্ভুত কল্পনা-শক্তি মিনারের সর্বাঙ্গে স্বপ্রকাশ, সে-কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি দর্শককে কোন্ দ্যুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কে জানে?

ইমারৎ তৈরি করা কত সোজা! কারিগরের হাতে সেখানে কত অজস্র মাল-মশলা! গম্বুজ, থাম, আর্চ, ছত্রি, মিনারেট, ছজ্জা (ড্রিপস্টোন), কার্নিস, ব্র্যাকেট কত কী! তার তুলনায় একটা সোজা খাড়া স্তম্ভে সৌন্দর্য আনা কত শক্ত! এখানে শিল্পী সফল হয়েছেন শুধু সেটাকে কয়েকটি তলাতে বিভক্ত করে, সামঞ্জস্য রেখে প্রতি তলায় তাকে একটু ছোট করে করে, গুটি কয়েক ব্যালকনি লাগিয়ে দিয়ে এবং মিনারের গায়ে কখনো 'বাঁশী', কখনো 'কোণে'র নকশা কেটে। প্রপর্শনের এরকম চূড়ান্ত পৃথিবীর আর কোনো মিনারে পাওয়া যায় না।

আর তার গায়ের কারুকার্যও অতি অদ্ভুত। বাঁশী এবং কোণের উপর দিয়ে সমস্ত মিনারটিকে কোমরবন্ধের মতো ঘিরে রয়েছে সারি সারি লতা-পাতা, ফুলের মালা, চক্রের নকশা। এগুলো জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে

(১) গেল শতকের গোড়ার দিকে এক ইংরেজ-মেজরের হাতে কুৎবের মেরামতির ভার পড়ে। ব্যালকনি (গ্যালারির) রেলিঙগুলো ছিল না বলে তিনি সেখানে চারপাপড়ির নিজস্ব নকশা দিয়ে রেলিঙ বানান—নীচের হানিকুম্ব অর্থাৎ মৌমাছির চাকের নকশা মূল স্থপতির—এবং মাথায় 'নিজস্ব' কল্পনাপ্রসূত একটা মুকুট পরান। সেইটে দেখে দিল্লী-ওলারা সত্রাসে তারস্বরে চিৎকার করেছিল। বহুবৎসর পরে লর্ড কার্জন সেই মুণ্ডুটি কেটে নীচে নামিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেন।

এক সারি অন্তর অন্তর আরবী লেখার সার—সেগুলো জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাইয়ের কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মিনারটির পরিকল্পনা করেছে মুসলমান, যাবতীয় কারুশিল্প করেছে হিন্দু—ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টিকার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে গিয়ে যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল সে মিলন পরবর্তী যুগে কখনো ভঙ্গ হয়নি, কভু বা মুসলমানের প্রাধান্য বেশী, কোনো ইমারতে হিন্দুর প্রাধান্য বেশী। আট শত বৎসর এক সঙ্গে থেকেও হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যে) প্রথম দিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল আজও সেটি অটুট আছে।

কুৎবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর কোনো মিনার কখনো মাথা খাড়া করেনি। দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বহু বাদশা বহু ইমারৎ গড়েছেন কিন্তু 'কুৎবের চেয়েও ভালো মিনার গড়বো' এ সাহস কেউ দেখান নি। যে ইংরেজ দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট, রাজভবন গড়ে, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানিয়ে নিজকে অতুল বিড়ম্বিত করেছে, সেও বিলক্ষণ জানতো কুৎবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনো স্থপতির কর্ম নয়।[১]

আলাউদ্দীন খিলজীর মত দুঃসাহসী রাজা ভারতবর্ষে কমই জন্মেছেন। একমাত্র তিনিই চেয়েছিলেন, কুৎবের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তাই কুৎবের দ্বিগুণ ঘের দিয়ে তিনি আরেকটি মিনার গড়তে আরম্ভ করেন—বাসনা ছিল মিনারটি কুৎবের দ্বিগুণ উঁচু হবে। ইমারত মাত্রেরই একটা অপটিমাম্ সাইজ আছে—অর্থাৎ যার চেয়ে বড় হলে ইমারৎ খারাপ দেখায়, ছোট হলেও খারাপ দেখায় (সর্ব কলাতেই এ সূত্র প্রযোজ্য ; কিন্তু স্থাপত্যের বেলা এটা অন্যতম মূলসূত্র)—কাজেই আলাউদ্দীনের চূড়া ডবল হলে ফল কি ওতরাতো বলা কঠিন। তা সে যা-ই হোক, মিনারের কাঠামোর কিছুটা শেষ হতে না হতেই ওপারের ডাক খিলজীর কানে এসে পৌঁছল যে-পারে খুব সম্ভব মিনার হাতে নিয়ে লাঠালাঠি চলে না।

আপন মহিমায়, নিজস্ব ক্ষমতায় যে স্তম্ভ দাঁড়ায় তার নাম মিনার, এবং মসজিদ, সমাধি কিংবা অন্য কোনো ইমারতের অঙ্গ হিসেবে যে মিনার কখনো

---

(১) অক্টরলনি মনুমেণ্টে কোনো কলাপ্রচেষ্টা নেই বলে সেটাকে কুৎবের সঙ্গে তুলনা করা অন্যায়—সেটাকে চটকলের চোঙার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড়-বাজারের দালানকোটার সঙ্গে কেউ তাজের তুলনা করে না।

থাকে, কখনো থাকে না, তার নাম মিনারেট—মিনারিকা। কুৎবের পর পাঠান যোগল বিস্তর মিনারেট গড়েছে; কিন্তু সেগুলোও কুৎবের কাছে আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা ভুবনবিখ্যাত; কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতমস্তকে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পৌঁছিয়ে খাড়া করেছেন। পাছে লোকে তাঁর মিনারিকার সঙ্গে কুৎবের তুলনা করে লজ্জা দেয় তাই তিনি সেটাকে গড়েছেন এমন ন্যাড়া করে যে দর্শকের মন অজান্তেও যেন কুৎবকে স্মরণ না করে। না হলে যে-তাজের সর্বাঙ্গে গয়নার ছড়াছড়ি তার চারখানা মিনারিকা-হস্তে 'নোয়াটুকুর' চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন, হুমায়ুনের সমাধি-নির্মাতা ছিলেন আরও ঘড়েল—তিনি তাঁর ইমারৎটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বর্জন করে।

দিল্লী-আগ্রার বহু দূরে, কুৎবের আওতার বাইরে গুজরাতের রাজধানী আহমদাবাদে আমি একটি মিনারিকা দেখেছি যার সঙ্গে কুৎবের কোনো মিল নেই এবং বোধ হয় ঠিক সেই কারণেই তার নিজস্ব মূল্য আছে। রাজা আহমদের—এঁরই নামে আহমদাবাদ—বেগম রানী সিপ্রির মসজিদে একটি মধুরদর্শন মিনারিকা বহু ভূপর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গুজরাত এবং রাজপুতনার মেয়েরা তাদের বাহুলতা মণিবন্ধে যে বিচিত্র আকার, বিচিত্র-দর্শন অসংখ্যবলয়-কঙ্কণ পরে এ মিনারিকা যেন সেই কমনীয়তায় অনুপ্রাণিত! রাজেশ্বরী সিপ্রি যেন তাঁরই অনুপম হাতখানি নভোলোকের দিকে তুলে ধরেছেন ভুবনেশ্বরের ললাটে তিলক পরিয়ে দেবেন বলে!

কুৎবের সঙ্গে সঙ্গে—আসলে কুৎব তৈরী হয় প্রথম তলা থেকে নমাজের আজানের জন্য—নির্মিত হয় কুওওতুল ইসলাম মসজিদ। এ মসজিদে এখন দর্শনীয় তার উন্নতদর্শন তোরণ (আর্চ) এবং স্তম্ভগুলি। ভারতীয় কারিগর তখনো জোড়ের পাথর (কী-স্টোন) তৈরী করে তার গায়ে গায়ে চৌকো পাথর লাগিয়ে আর্চ বানাতে শেখেনি বলে[১] আর্চের সঙ্গে জোড়া বাকি ইমারৎ ভেঙে

(১) ইঞ্জিনিয়ারিঙ স্থাপত্যের অংশ বটে কিন্তু বিশুদ্ধ স্থাপত্য-রস আস্বাদনের সময় তার স্থান অতি নিচে। আর্চ, ডোম্ বানাতে 'কী-স্টোন' ইত্যাদি ইঞ্জিনিয়ারী ব্যাপার পাঠক চেম্বারস অভিধান দেখেই বুঝে নিতে পারবেন। এসব স্থাপত্যের পশ্চাতে কী অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিঙ্ স্কিল আছে তার আলোচনা আমি আদপেই করিনি। যেমন, কুৎবের আসল কেরামতি যে এত অল্প গোড়া (বেস্) নিয়ে এত উঁচু মিনার আর কোথাও হয়নি। অদ্ভুত ভারসামাই (ব্যালান্স্)

পড়েছে; কিন্তু রসের বিচারে এ আর্চটি এখনো অতুলনীয়। এর শান্ত গাম্ভীর্য, আপন কৌলীন্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত ঋজু অবস্থিতি নিতান্ত অরসিক জনেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পরবর্তী যুগে বহু জায়গায় বিস্তর আর্চ নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এর প্রসাদগুণ এখনো অতুলনীয়।

এবং এর গায়ে যে হিন্দু কারুকার্য তার সুনিপুণ দক্ষতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং মন্দাক্রান্তা গতিচ্ছন্দ দেখে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন অজন্তা ইলোরার চিত্রকর শিলাকর দুজনে মিলে প্রাণের আনন্দে এর প্রতিটি রেখা প্রতিটি বক্র প্রতিটি চক্র এঁকে চলেছে। এদের নিশ্চয়ই বলা হয়েছিল যে মুসলমান স্থাপত্যে পশুপক্ষী আঁকা বারণ। সেইটে মেনে নিয়ে কী আশ্চর্য নৈপুণ্যে 'শেষনাগ' মতিফকে এরা সাপ না বানিয়েও সাপ এঁকেছে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কলার সঙ্গে এরা কুরানের হরফও খোদাই করেছে সমান দক্ষতা নিয়ে। উভয়ের সংমিশ্রণ অপূর্ব, রসসৃষ্টি অসামান্য।

কুওওতুল ইসলাম মসজিদের থামগুলো হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির থেকে নেওয়া। এদের গায়ে দর্শক বিস্তর পশুপক্ষী, বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য এবং অন্যান্য দেব-দেবীর নানা মূর্তি দেখতে পাবেন। মসজিদ গড়ার সময় এগুলোর গায়ে পলস্তরা লাগিয়ে মূর্তিগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পলস্তরা খসে যাওয়াতে এখন আবার দেখা যাচ্ছে।

এভাবে প্রতিটি ইমারৎ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তা হলে দশ ভলুমি কেতাব লিখতে হয়—এবং সেগুলো কেউ পড়বে না। আমার উদ্দেশ্য—বাকি ইমারৎগুলো দর্শক যেন নিজে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।

যেমন কুওওতুল ইসলামের গম্বুজ রসের ক্ষেত্রে নগণ্য—তার পরের ইমারত ইলতুৎমিশের সমাধিতে সেটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে—খিলজী যুগে সেটা সুন্দর হতে আরম্ভ করেছে, তুগলুক যুগে গম্বুজ রীতিমত রসসৃষ্টি করে ফেলেছে, সৈয়দ-লোদী যুগে সে পৃথিবীর আর দশটা গম্বুজের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে, হুমায়ুনের গম্বুজকে তো কেউ কেউ তাজের চেয়েও ভালো বলেছেন, আর তাজের তত্ত্বস্থ তার কারণ। এ যেন বাজিকর হাতের আঙুলের ডগায় বিশগজী বাঁশ খাড়া করে রেখেছে। ইঞ্জিনিয়ারী হিসেবে কণামাত্র ভুল থাকলে কুৎব হুড়মুড়িয়ে পড়ে যেত।

গম্বুজ, শুনি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখলে পরে তার ক্ষীণ কটিকে নাকি জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে।

কিংবা আর্চে উত্থান পতন দেখুন। কিংবা দেখুন ছত্রির আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ। হুমায়ুনের কবর ও তাজের ছাতের উপরকার ছত্রির মতো ছত্রি পৃথিবীতে আর কোথাও পাবেন না। স্থাপত্যে ছত্রির ব্যবহার মুসলমানরা এদেশে এসে শিখল। তাই এদেশের স্থাপত্যের স্কাই-লাইন ইরান তুরানের স্থাপত্যকে এ-বাবদে অনায়াসে হার মানায়।

কিংবা দেখুন, ভিতরকার কারুকার্য, যার পরিসমাপ্তি তাজের 'মর্মরস্বপ্নে'।

দাস-যুগের শেষের দিকে মুসলিম জিওমেট্রিক ডিজাইনের বাড়াবাড়ি হয়েছিল, খিলজি-যুগে আবার ভারসাম্য ফিরে পেল।

তুগলুক-যুগে পাবেন দার্ঢ্য—শক্তিশালী স্থাপত্যের পরিপূর্ণতা। অলঙ্কার এখানে বাহুল্যরূপে বর্জিত। দেয়াল বাঁকা—যেন পিরামিডের ঢঙে ট্যারচা করে একে আরও মজবুত করার চেষ্টা হয়েছে, গম্বুজও শক্তির পরিচায়ক। লাল পাথর, কালো শ্লেট (তখনো কালো মার্বেল এ-দেশে আসেনি) এবং মর্মরের ধবল এই তিন রঙের খেলা নিয়েই স্থপতি এখানে অলঙ্কারহীন দৃঢ়তার একঘেয়েমি ভেঙেছেন। গিয়াসউদ্দীন তুগলুকের কবর এরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

সৈয়দ-লোদী বংশদ্বয়ের অর্থ ও প্রতিপত্তি দুই-ই ছিল সামান্য। তাই এঁদের কলা-প্রচেষ্টা ছোট ইমারতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ওদিকে ইরান-তুরানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বলে সে-দিক থেকে নব নব অনুপ্রেরণাও আসছিল না। ফলে তাদের স্থাপত্যে হিন্দু প্রাধান্য বেশী এবং ছোট ইমারতে অলঙ্কারের প্রয়োজন বড় ইমারতের চেয়ে বেশী। কম্পজিশনেও এই প্রথম হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট হয়ে এল। বস্তুত এই আটকোণগুলো ইমারৎ এবং আট দিকের ঘেরা বারান্দা বৌদ্ধস্তূপ এবং তার প্রদক্ষিণচক্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হিন্দুরা স্তম্ভ নির্মাণে চিরকালই দক্ষ, ছত্রিও তাদেরই সৃষ্টি। হিন্দু ছজ্জা (ড্রিপ-স্টোন—এগিয়ে আসা কার্নিসের মত) ছাতের বৃষ্টি ছড়িয়ে দেবার জন্য এদেশে প্রয়োজন—ইরানে দরকার নেই বললেও চলে—সে সব এসে এখানে ইমারতের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। তুগলুক প্রভাব এখানে অতি সামান্য—কেবল মাত্র ট্যারচা স্তম্ভে কিছুটা পাওয়া যায়। সৈয়দ-লোদী স্থাপত্য দেখে মানুষ হতবাক হয় না সত্য, কিন্তু এর এমন একটা কমপেক্টনেস্ বা ঠাস-বুনুনি আছে যা

অন্ত স্থাপত্যে বিরল। অল্প দিয়ে রসসৃষ্টিতে সৈয়দ-লোদী প্রথম না হলেও প্রধানদের একজন।

মোগল-যুগ আরম্ভ হল হুমায়ুনের কবর দিয়ে। সেখানে ইরান-তুরানের প্রাধান্য। কিন্তু ছত্রি এবং পদ্মফুলের ডিজাইন এখানে প্রচুর এবং কারুকার্যেও হিন্দু প্রাধান্য বেশী। সিক্রিতে ইরানী ভাব এত কমে গিয়েছে যে, কোনো কোনো ইমারতে কার প্রাধান্য বেশী কিছুতেই স্থির করা যায় না। সিকন্দ্রার গম্বুজ শেষ করার পূর্বেই আকবর ইহলোক ত্যাগ করেন—তাই বলা শক্ত সম্পূর্ণ সমাধি মনে রসের কোন্ ভাবের উদয় করে দিত। দিওয়ান-ই-খাস্ ও আম্ যে অলঙ্কারের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে সে সত্য তো পৃথিবীর সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। এত দিন বলা হত, পাঠান স্থাপত্যে স্থপতি ও স্বর্ণকার একজোটে কাজ করেছেন। দিওয়ান-ই-খাস্ ও আম্ দেখে লোকে বলল, এইবারে এসে জহুরীও যোগ দিয়েছেন।

মোগল-কলা এত বিচিত্র ও ভিন্নমুখী যে, তাকে গুটিকয়েক সূত্রে ফেলা প্রায় অসম্ভব। তবে স্থাপত্যের বিকাশ দেখতে হলে সবচেয়ে উত্তম পন্থা হুমায়ুনের কবর ও তাজ দুটি মিলিয়ে দেখা। দুটোর গম্বুজ মিলিয়ে দেখুন, ছত্রিগুলো কার ভালো ; এখানে বলা উচিত হুমায়ুনের ছত্রিগুলো নীল টাইলে ঢাকা ছিল : এখন উঠে গিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে—তাই আগে ছিল গম্বুজ মর্মরের সাদা, পুরো ইমারত লাল পাথরের লাল আর ছত্রিগুলোর গম্বুজ নীল ; তাজে তিনই মার্বেলের।; হুমায়ুনের ভিত্তিতে এক সার আচ। তার ভিতর দিয়ে নিচে যাওয়া যায়), তাজে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মাত্র, গুলদস্তাজ্ (মিনারিকা ও ছোট মিনারিকা যার শেষ হয় অর্ধস্ফুট পদ্মকোরকে—দুই ইমারতে এক রকম ; নির্মাণকালে হুমায়ুনে ছিল লাল-সাদা-নীলের সামঞ্জস্য, তাজ শুভ্র-ধবল এবং সবচেয়ে বড় পার্থক্য—হুমায়ুনে মিনারিকা নেই, তাজের চার কোণে চারটি। আপনার কোন্‌টি ভালো লাগে ? আর এই শৈলীর অধঃপতন দেখতে হলে দেখুন।

স্পষ্ট দেখছি হুমায়ুনে দার্ঢ্য, তাজে মাধুর্য।

তার কারণ, অনেক ভেবে আমি মন স্থির করেছি, হুমায়ুনের সমাধি নির্মাণ করেছেন তাঁর বিধবা—স্বামীর জন্য, তাই তাতে পৌরুষ সমধিক। তাজ নির্মাণ করেছেন বিরহকাতর স্বামী—প্রিয়ার জন্য। তাই সেটিতে লালিত্য বেশী।

১৯৫৪ ॥

বেজো না চরণে চরণে

বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কাছে নাকি নবীন সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখা নিয়ে গিয়ে চাঁইদের সার্টিফিকেট চান। বেচারীদের বিশ্বাস, চাঁইরা উত্তম সার্টিফিকেট দিলে তাঁরা সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিপ্রতিপত্তি পেয়ে যাবেন।

চাঁইদের কেউ-কেউ সার্টিফিকেট দেন, কেউ লেখককে অন্য চাঁইদের কাছে পাঠিয়ে দেন, কেউ বা অসুখের ভান করে দেখাই করেন না। এ বাবদে পূজনীয় রাজশেখরবাবু রাজকীয় পন্থাটি বের করে আরামসে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি সবাইকে অকাতরে সার্টিফিকেট দেন—এমন কি মাঝে-মধ্যে না চাইলেও দেন। তার বয়স হয়েছে। শেষের ক'টি দিন শান্তিতে কাটাতে চান। সোজাসুজি 'দেব না' বললে তাঁকে আর বাঁচতে হবে না, এবং 'দেব-দিচ্ছি' 'দেব-দিচ্ছি' করে টাল-বাহানা দেবার মতো শক্তিও তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথ অমিতবীর্য পুরুষ-সিংহবৎ ছিলেন, উমেদওয়ারদের ঠেকাবার মতো তাঁর সেক্রেটারিও ছিলেন—তবু তিনিও অকাতরে সার্টিফিকেট দিতেন। প্রাণের প্রতি তাঁর অহেতুক কোনো মায়াও ছিল না—'মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' এ গান তিনি রচেছেন অল্প বয়সেই—তবু তিনি 'না-চাহিতে যারে দেওয়া যায়' ভাবখানা মুখে মেখে পিলপিল করে সার্টিফিকেট বিলোতেন। আমাকে পর্যন্ত তিনি একখানা দিয়েছিলেন—অবশ্য সাহিত্যের জন্য নয়, চাকরির জন্য। আমি তাঁর 'কৃতী ছাত্র' এ ধরনের বহুবিধ আগড়ম-বাগড়ম লিখে তিনি আমাকে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু বিচক্ষণ লোক; তিনি আমাকে চাকরি দেননি। অন্যত্র চেষ্টা করার জন্য সার্টিফিকেটখানা ফেরত পেলুম না—কারণ চিঠিখানা ছিল নিতান্ত প্রাইভেট এবং পার্সনাল। শ্যামাপ্রসাদবাবু রবিবাবুর সার্টিফিকেটের মূল্য না দিলেও রবিবাবুর হাতের লেখা চিঠির মূল্য জানতেন। চিঠিখানা সযত্নে শিকের হাঁড়িতে তুলে রেখে দিয়েছিলেন।

এবং যাঁরা কিছুতেই সার্টিফিকেট দিতে রাজী হন না, তাঁদের দু'-একজনকে

আমি চিনি। এবং এ কথাও বিলক্ষণ জানি, তাঁরা যে-সব বইয়ের সার্টিফিকেট দেওয়া দূরে থাক, গাল-গালাজ পর্যন্ত করেছেন তারই অনেকগুলো বাজারে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে! রাজশেখরবাবুর 'দুই সিংহ' গল্পে আছে কোনো লেখক তাঁর বই কিছুতেই বিক্রি হচ্ছে না দেখে কোনো এক বাঘা সাহিত্যিককে ঘুষ দিয়ে লিখিয়ে নেয়, বইখানা অতিশয় অশ্লীল এবং কদর্য। ফলে নাকি সে বইয়ের প্রচুর কাটতি হয়েছিল।

কিন্তু এ-সব শোনা কথা, কিংবা কাল্পনিক। রবিবাবু টাকের ওষুধের প্রশংসা করাতে ওষুধের বিক্রি বেড়েছিল কি না তার সঠিক স্টাটিস্‌টিক্‌স্ এখনো দেখিনি। উল্টোটাও সঠিক জানবার উপায় নেই। এ যেন আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। বেতারে আলিপুর বললে, 'সন্ধ্যায় বৃষ্টি হবে।' আপনি অবিশ্বাস করে চাতা না নিয়ে বেরলেন। ফিরলেন ভিজে ঢোল হয়ে। তবেই দেখুন, এমনি লক্ষ্মীছাড়া দফ্‌তর যে, অবিশ্বাস করেও নিষ্কৃতি নেই, বিশ্বাস তো করা যায়ই না।

*　　*　　*　　*

কিন্তু একখানা বই পড়ে আমি এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হদিস পেয়েছি।

বইখানার নাম 'লিমিট অব্ আর্ট'। চল্লিশ টাকা দাম। ঢাউস মাল। কপিকল দিয়ে শেলফ্ থেকে ওঠাতে নাবাতে হয়।

কবিতার চয়নিকা। গ্রীক-লাতিন থেকে আরম্ভ করে, ফরাসী-জর্মন-ইংরিজি-স্পানিশ রুশ তাবৎ ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতা সঞ্চয় করে এ-চয়নিকাটি নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সবিনয় নিবেদন করেছেন, তিনি এ-চয়নিকার মাধুকরী করার সময় নিজের ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করেননি। তবে কি তিনি বন্ধুবান্ধবদের রুচির উপর নির্ভর করেছেন? তাও নয়। তিনি লিখেছেন, বিখ্যাত প্রখ্যাত কবিরা যে-সব অন্যান্য কবির কবিতার প্রশংসা করেছেন তাই দিয়ে তিনি এ-'সঞ্চয়িতা' নির্মাণ করেছেন। যেমন মনে করুন, বায়রন বলেছেন, 'পেত্রার্কের এ ছত্র কটি কী চমৎকার, কি অনিবর্চনীয়!' চয়নিকাকার সেই কবিতাটি তুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়রনের প্রশস্তিটিও তুলে দিয়েছেন। ঠিক এইভাবেই, শেকসপিয়র আছেন গ্যোটের প্রশংসাসহ, কীট্‌স আছেন শেলির তারিফযুক্ত, এবং আরো বিস্তর চেনা-অচেনা কবি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এর চেয়ে আর উত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?

কিন্তু বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, এ-রকম রদ্দি, ওঁচা কবিতার সঙ্কলন আমি জীবনে কোনো ভাষাতে কখনো দেখিনি।

এবং শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সর্বোত্তম বেশ কয়েকটি কবিতা তাতে বাদ পড়েছে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, একবার এই বঙ্গভূমিতেই এ-ঘটনা ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ কবিতা বাঙালী পাঠকের ভালো লাগে তারই ভোট নিয়ে একখানি 'চয়নিকা' রচিত হয়েছিল। তাতে এত বেশী ভালো কবিতা বাদ পড়ে গিয়েছিল, এবং অপেক্ষাকৃত কাঁচা লেখা ঢুকে গিয়েছিল যে এর পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে চয়ন করেন সেটিই 'সঞ্চয়িতা' এবং বাজারে সেইটেই চালু। এস্থলে পাঠক অবশ্য বলবেন, 'রাস্তার লোকের ভোট নিয়ে কি আর উত্তম কবিতা-সঞ্চয়ন হয়? ওদের কীই বা বুদ্ধি, কীই বা রুচি।' অতএব যে বিদেশী চয়নিকা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেইটেতেই ফিরে যাই।

অর্থাৎ ভালো ভালো কবি কর্তৃক নির্মিত সঞ্চয়নও উত্তম হল না কেন?

তার প্রধান কারণ, সাধারণ এবং সুরুচিসম্পন্ন পাঠক কবিতা পড়ে কিংবা গান শুনে যদি আনন্দ পায় তবেই সে বলে, কবিতা কিংবা গানটি ভালো। অর্থাৎ তার কাছে যে-কোনো বস্তু রসোত্তীর্ণ হলেই হল। কিন্তু কবি যখন অন্য কবির কবিতা পাঠ করেন তখন তাঁর নজর যায় কবিতার গঠন, ভাষা, ছন্দ, মিল—এক কথায় আঙ্গিকের দিকে! কবিতাটি রচনা করতে গিয়ে কবিতাকার কি কি মালমশলা নিয়ে আরম্ভ করেছেন, তাঁকে কোন্ কোন্ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন কি না পাঠককবির দৃষ্টি থাকে প্রধানতঃ সেই দিকে। কিংবা মনে করুন, আপনি আমি যখন গান শুনি তখন গানটি মিষ্ট এবং মর্মস্পর্শী হলেই হল। পক্ষান্তরে আকছারই দেখবেন, বদখদ গলা নিয়ে, বিদকুটে মান্ধাতার আমলের একটা সম্পূর্ণ অজানা রাগ ধরলে এক হাড়-চিমসে গাওয়াইয়া। তবলচীও বাজাতে লাগলো এমন এক তাল যে তার কোথায় সম, কোথায় ফাঁক কিছুই মালুম হচ্ছে না। আপনি বিরক্তিতে উঠি-উঠি করছিলেন, এমন সময় দেখেন হঠাৎ মহফিলের অন্য গাওয়াইয়া শ্রোতারা 'আহা, আহা, ক্যাবাৎ, ক্যাবাৎ' বলে অচৈতন্নি প্রায়। কি হল? ব্যাপারটা কি? না এই ওস্তাদস্য ওস্তাদ এক অ্যাসন অতি-অতি-কোমল এমন এক কঠিনস্য কঠিন জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে অ্যাসা এক পানিপথ নাকি জয় করেছেন যা পূর্বে নাকি কেউ কখনো করতে পারেনি—না, তানসেন নাকি মাত্র দু'বার পেরেছিলেন, ওস্তাদ আব্দুল করীম কুল্লে একবার! ব্যস, হয়ে গেল!

অবশ্য সব পাঠক-কবি কিংবা শ্রোতা-গাওয়াইয়াই যে শুদ্ধমাত্র আঙ্গিক এবং টেকনিকল স্কিলের দিকে এক-চোখো দৈত্যের মতো তাকিয়ে থাকেন সে কথা বলছি না—তবে ঐ হল গিয়ে নিয়ম, এবং পূর্বোল্লিখিত 'লিমিট্ অব্ আর্ট' ঐ পর্যায়ের বই।

সমসাময়িক লেখক যখন অন্য লেখকের লেখা পড়েন তখন আরেক মুশকিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা খোলসা করি।

এই মনে করুন, গৌরকিশোর ঘোষ রম্য-রচনা লিখে দেশে নাম করে ফেলেছেন। আমারও বাসনা গেল, ঐ লাইনে যখন খ্যাতি আছে, পয়সাও থাকতে পারে তখন আমিই বা বাদ যাই কেন? গৌরকিশোরের লেখার অনুকরণে আমিও কয়েকটি রম্য-রচনা লিখে নিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। তিনি দেখলেন, তাঁর এক নবীন শাকরেদ জুটলো, তাঁর অনুকরণে এবার একটা 'স্কুল' 'ঘরানা' গড়ে উঠতে চললো। আমার রচনা যে আদপেই 'রম্য' হয়নি, এমনকি এরে 'রচনা' কওয়া যায় না সেদিকে তাঁর নজরই গেল না। তিনি সার্টিফিকেট দিলেন, 'তোফা লেখা, খাসা লেখা, বেড়ে লেখা!' আমিও খুশী। অবশ্য এ সার্টিফিকেট আমি এখনো কাজে লাগাইনি। সাহিত্যিকের সার্টিফিকেট-হাল পাঠকের পানি পাবে কি না সে বাবদে আমার মনে এখনো ধোঁকা রয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে ফরাসী কবি-সম্রাট মলিয়ের নাকি তাঁর তাবৎ কৌতুকনাট্য পড়ে শোনাতেন তাঁর নিরক্ষরা বাড়িউলীকে। বাড়িউলী যে-সব রসিকতা শুনে হাসতো, তিনি সে-সব রসিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন; যেগুলো শুনে গম্ভীরমূর্তি ধারণ করতো সেগুলো তিনি নির্মম ভাবে কেটে দিতেন। অথচ আজ তো গুণীমূর্খ সবাই তাঁর নাট্য দেখে আনন্দ লাভ করে। এই কয়েকদিন মাত্র হল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত তাঁর বাঙলা অনুবাদ কলকাতার রসিক সমাজকে যা হাসালো তা দেখলে স্বয়ং মলিয়েরই অবাক হতেন।

তবে কি ঐ বাড়িউলী অতিশয় সুরসিকা ছিলেন? এ পর্যন্ত কেউ তো তা বলেননি। তবে কি ওঁকে না শুনিয়ে সে-যুগের নামকরা সমঝদারকে শোনালে মলিয়েরের কাব্য আরো রসোত্তীর্ণ হত? বলা অসম্ভব।

* * * *

যে নল চালিয়েছিলুম, সে তবে এখন এসে খাড়া হল কোথায়, পাকড়ালো কাকে? অর্থাৎ হরে-দরে দাঁড়ালো কি?

আমার বিশ্বাস এ-নল কোথাও দাঁড়াবে না। এ আলোচনায় কস্মিনকালেও কোনো হদিস পাওয়া যাবে না।

তবে যদি শোধান, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কি, তবে আমি নবীন লেখককে অকুণ্ঠ ভাষায় বলবো, সার্টিফিকেট কুড়োতে যেয়ো না। ওতে কানাকড়ির লাভ নেই। ঐ যে পাঠক-সম্প্রদায় নামক কিম্ ভূত কিম্ আকার জীব আছে সে যে কখন কার প্রতি সদয়, কার প্রতি নির্দয়, কখন কাকে আশা-গাছের শাখায় চড়ায়, আর কখন কাকে নির্মমভাবে জিল্‌ট্‌ করে তাহা হদিস কেউ কখনো পায়নি।

অবশ্য আপনি যদি ভবিষ্যৎ যুগের পাঠকের জন্য লেখেন তবে আপনার কোনো ভাবনা নেই। তবে সে-কথাটা পুস্তকের অবতরণিকায় বলে দিলেই সাধু আচরণ হয়। এ বছরের তাজা মাছকে আসছে বছরের শুঁটকি বলে চালানো জোচ্চুরির শামিল। পঞ্চাশ বছর পরে যে র মাস মেচ্যোর লিক্যোর হবে সেটা আজ বাজারে ছাড়া ধাপ্পা। তার জন্য আজ যে-লোক সার্টিফিকেট দেয় সেও ধাপ্পাবাজ।

* * * *

হালে আকাশে এক নয়া চিড়িয়ার উদয় হয়েছে।

নিজের সার্টিফিকেট নিজে লিখে, কিংবা/এবং চেলা-চামুণ্ডাদের সামনে নিজের লেখার গুণকীর্তন করতে গিয়ে পয়েন্ট বাৎলে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে নিয়ে কিংবা/এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্যান্য লেখাতে সে লেখা সম্বন্ধে দারুণ-দারুণ রেফরেন্‌স্ ঝেড়ে—সব কিছু প্রকাশককে দিয়ে বিজ্ঞাপনরূপে ছাপিয়ে দেওয়া।

এ সিস্টেমের সঙ্গে 'আধুনিক বাঙলা কবিতার' বেশ মিল আছে। বাঙলা ভাষায় লেখা দেখে পড়তে গিয়ে মালুম হল যে কিছুই মালুম হচ্ছে না—এ-ভাষার শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কৃৎ তদ্ধিত আপনি কিছুই জানেন না। অর্থাৎ বন্ধু বাঙলা ভাষার মুখোশ পরে অজানাজন এসে মেরেছে চাকু।

প্রকাশকের মুখোশ পরে এখানে আসে লেখক—হাতে চাকু! পাঠক, সাবধান!

রবীন্দ্রনাথ কি যেন গেয়েছেন, দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমাকে ডরাবো না? এ তার উল্টো পিঠ; মিত্রের বেশে এসেছে বলে তোমারেই যত ভয়।

এ সিস্টেম পাঠক-ব্যাঙ্কারের চালানো জুয়ো-ভূমি মণ্টে কার্লোর ব্যাঙ্ক ভাঙতে পারবে কি না, সেই খবরের প্রত্যাশায় আছি। এ-যাবৎ তো কোনো সিস্টেম পারেনি।

আর যা করুন, করুন, কিন্তু পাঠকসাধারণকে আহাম্মুখ ঠাউরে আপন আহাম্মুখির পচা ডিম হাটের মধ্যিখানে ফাটাবেন না!!

ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ

গত ৩রা সেপ্টেম্বর ইভান তুর্গেনেফের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ-উপলক্ষে বহু দেশে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আপন আপন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। কলকাতা বেতারকেন্দ্র পর্যন্ত সেদিন তাঁকে স্মরণ করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আজ এঁর, কাল ওঁর কত লোকের মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী নিত্য নিত্য হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর হিসেব রাখতে যাবে কে?

যার যে রকম খুশী, এর বেশী কিছু বলা যায় না।

তাই জানি, আমরা যখন গোরস্তানে যাই, তখন খুঁজি আপন প্রিয় ও পরিচিতজনের কবর। যখন কোনোও নূতন লাইব্রেরিতে ঢুকি তখন খুঁজি আপন প্রিয় লেখকের বই। তাই তুর্গেনেফের শতবার্ষিকী না হয়ে ৭৫তম মৃত্যুদিনও আমার ও আমার মতো বয়স্কদের মনে দোলা লাগিয়েছে। তরুণরা লাইব্রেরিতে যে-রকম নূতন বইয়ের সন্ধান নেয়, ক্ল্যাসিক্‌স্ পড়ে না, ঠিক তেমনি তারা তুর্গেনেফ কিংবা হাইনের শতাব্দীপ্রয়াণও স্মরণ করে না; তারা স্মরণ করে র‍্যাঁবো কবে হেঁচেছিলেন, ভেরেরেন কবে কেশেছিলেন।

তা তারা করুক। কিন্তু যখন দেখি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং তথাকথিত শিক্ষিত লোকও সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছেন র‍্যাঁবোর কাছে রবি ঠাকুর শিশু, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর উডেন্ (কাষ্ঠরস), এবং সম্পাদক-মণ্ডলীও সেগুলো পরম শ্রদ্ধাভরে ছাপাচ্ছেন, তখন এঁরা যে তুর্গেনেফকে স্মরণ করবেন না সে তো জানা কথা। শুধু তাই নয়, এখন আপনার আমার পক্ষে তুর্গেনেফ কিংবা সত্যেন দত্তকে স্মরণ করতে হলে লণ্ডনে রঙিন হওয়ার মতো রীতিমত সঙ্কট-সঙ্কুল—রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে 'খতরনাক্'—স্কন্ধোপরি মুণ্ড-শিরের প্রয়োজন!

আমি মুসলমান। আমার শাস্ত্রে আছে বিধর্মীর ভয়ে আল্লা রসুলকে বর্জন করা মহাপাপ। আমার সাহিত্যধর্মে গুরু-মুর্শীদ হয়ে আছেন রবি ঠাকুর, হাইনে, তুর্গেনেফ, মাইকেল। আজ এদের অস্বীকার করতে পারব না—র‍্যাঁবো এলিয়ট সম্প্রদায় যতই শক্তিশালী হন না কেন।

এবং আমার মনের গোপন কোণে একটা অহেতুক ক্ষীণ আশা আছে যে, তুর্গেনেফ প্রীতিতে আমি একেবারে একা নই। 'বুড়া রাজ' প্রতাপ রায়ে'র মতো 'বরজলালের' হাত ধরে আমাকে একাকী সভাস্থল ত্যাগ করতে হবে না। প্রতাপ রায়ের সমকালীন শ্রোতা সে-সভাতে আর কেউ ছিল না। আমার কিন্তু এখনও অনেক মুরুব্বী আছেন। তাঁরা তুর্গেনেফ সম্বন্ধে আমার চেয়ে ঢের ঢের ভালো লিখতে পারেন, কিন্তু লেখেন না, কারণ তাঁরা জানেন, পাগলা গারদে সুস্থ লোকের লক্ষণ দেখানো পাগলামি, ভেক যেখানে রব ছেড়েছে সেখানে কোকিলের পক্ষে মৌনতা শ্রেয়—'ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জলদাগমে।'

তুর্গেনেফের মন্দ ভাগ্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি থাকতেন বিদেশে—জার্মানি এবং ফ্রান্সে—এবং সেখানে বসে বসেই তিনি জানতে পেতেন কী ভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি দস্তেয়েফস্কি, তলস্তয় এমন কি কবি নেক্রাসফেরও বিরাগভাজন হয়েছেন। 'বিরাগভাজন' বললে বোধ করি কমই বলা হল। তুর্গেনেফ শেষের দিকে রীতিমত এঁদের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন।

বিদ্বেষ আসে হিংসা থেকে। এঁদের সবাই বড় লেখক। জীবিতাবস্থায়ই এঁরা দেশে প্রচুরতম সম্মান পেয়েছিলেন। তবে দূরদেশবাসী প্রবাসী নিরীহ ('নিরীহ' কেন সে কথা পরে হবে) তুর্গেনেফ তাদের ক্রোধের কারণ হয়েছিলেন কেন?

এ-তত্ত্বটি বুঝতে পারলেই জানা যাবে লেখক হিসাবে তুর্গেনেফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাহাত্ম্য কোনখানে?

দস্তেয়েফস্কি ও তলস্তয় জানতেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের আপন মাহাত্ম্য কোন্ খানে। দস্তেয়েফস্কি তাঁর প্রতি চরিত্রের গভীরতম অন্তঃস্থলে পৌঁছে গিয়ে তার সুখদুঃখ, তার দুর্বলতা মহত্ত্ব, তার প্রচেষ্টা এবং ভাগ্যে দ্বন্দ্ব, সমাজ-প্রবাহের খর-স্রোতের বিরুদ্ধে তার উজান চলার আপ্রাণ প্রয়াস, কিংবা সে-স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে যেতে যেতে তাকে প্রাণ ভরে অভিসম্পাত—এসব-কিছু লোহার কলম দিয়ে পাথরের উপর খোদাই করতে পারেন, ভাস্করের মতো দৃঢ়পেশী সবল হস্তে। প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর হাতে যেন দৈত্যের হাতে প্রজাপতি। চোখে একস্রে, বুকে অসীম করুণা। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, একটা বিরাট এঞ্জিন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। খেলার এঞ্জিন যত তেজেই এগিয়ে আসুক না কেন, জানি, ভালো করেই জানি, সামান্য কড়ে আঙুলটি তার সামনে ধরলেই সে থেমে যাবে, কিন্তু দস্তেয়েফস্কির এঞ্জিন পিঁপড়ের গতিতে এলেও তার সামনে যা পড়বে

তার আর উদ্ধার নেই। অরসিকতম পাঠকেরও সাধ্য নেই, তাঁর বর্ণনা পড়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা না শুনে বা বুঝে থাকতে পারে। কিংবা বলব, কুমির যে-রকম ছাগলের বাচ্চার ঠ্যাং কামড়ে ধরে ডুব দেয় নদীতে, দস্তয়েফস্কি সে-রকম পাঠককে নিয়ে ডুব দেন মানব-চরিত্রের অতল সায়রে। এবং আশ্চর্য, সেখানে মণি-মুক্তার সঙ্গে সঙ্গে যে ক্লেদ পঙ্ক দেখি তার প্রতিও তো ঘৃণা হয় না। মাতাল বাপের উচ্ছৃঙ্খলতায় সরলা কুমারী রাস্তার বেশ্যা হয়ে বাপকে মাতলামোর পয়সা জোগাচ্ছে—কই লোকটাকে তো খুন করতে ইচ্ছে করে না। তার অসহায় অবস্থা দেখে শুধু ভগবানকে শোধাতে ইচ্ছে করে, 'একে বিবেকহীন পাষণ্ডরূপে জন্ম দিলে না কেন? এরও তা হলে কোনো দুঃখ থাকত না, আমরাও অকরুণ হৃদয়ে তাকে খুন করতে পারতুম। কিন্তু এ সব বোঝে, এ তো সব কিছু জানে। তবে এই ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঘূর্ণিবায়ুর মাঝখানে মানুষকে তুমি প্রজাপতির মতো সৃষ্টি করলে কেন?' কিংবা হয়ত অতখানি চিন্তা করার শক্তিই পাঠকের থাকে না। মোহমান হয়ে যায় পাঠক সেই বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার সামনে—সমস্ত জীবন বয়ে বেড়ায় তার অনপসরণীয় স্মৃতি।

তলস্তয়ের রঙ্গমঞ্চ ভুবন-জোড়া বিরাট। তার পাত্রপাত্রীদের নাম ভুলে যাই, কিন্তু চেহারা ভুলিনে। তারা রঙ্গমঞ্চে নাচছে যে যার আপন কোণে আপন আপন মণ্ডলী বানিয়ে। প্রত্যেকের আপন নৃত্য সামঞ্জস্য রেখেছে তার মণ্ডলীর সঙ্গে, মণ্ডলী সামঞ্জস্য রেখেছে আর আর মণ্ডলীর সঙ্গে—কখনও বা দুই কিংবা তিনটি মণ্ডলী একে অন্যকে ভেদ করে মিশে এক হয়ে গিয়ে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে—আর সব কটি মণ্ডলীর এ-কোণে ও কোণে যে কটি ছন্নছাড়া আপন মনে নাচছে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছে সেই বিরাট ভুবন। বাস্তব জীবনেও আমরা এ-রকম ভুবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাইনে। তলস্তয় কতখানি পেয়েছিলেন কে জানে কিন্তু তাতে কাই বা যায় আসে। তাঁর কল্পনার ভুবন আমাদের বাস্তব ভুবনের চেয়ে ঢের ঢের বেশী প্রত্যক্ষ, অঙ্গে অঙ্গে প্রাণবন্ত।

তলস্তয় কখনও কবিতা রচনা করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি কবি। তাঁর ভানুমতী দণ্ড দিয়ে তিনি যে-রকম আমাদের কল্পনার অতীত বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন ঠিক তেমনি আমাদের নিত্যকার চেনা বস্তু—যে বস্তু বহুদর্শনের ফলে তার বৈশিষ্ট্য তার নবীনতা হারিয়ে ফেলেছে—তিনি সামনে তুলে ধরেন সেই চেনা রূপেই, অথচ মনে হয়, 'কী আশ্চর্য, একে এত দিন ধরে লক্ষ্য করিনি কেন?'

এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জেনে যাই যে, একে আর কখনও ভুলব না। তাই তাঁর পাত্রপাত্রী দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়। দস্তেয়েফস্কির চাষা ক্ভাস ভদ্‌কা না খেলেও সে রুশ চাষা, তলস্তয়ের চাষা অন্তহীন স্তেপের উপর দিয়ে ভেঙে চলেছে বরফের পাথার, সরাইয়ে ঢুকে সে তার চামড়ার ছেঁড়া ওভারকোট স্টোভের পাশে শুকোতে দেয়, আইকনের সামনে বিড়বিড় করে সে মন্ত্র পড়ে ডান হাতের তিন আঙুলে ডাইনে থেকে বাঁয়ে ক্রস্ করে, কিন্তু বারবার ভুলে যাই সে বাঙালী চাষা নয়। অবাক হয়ে ভাবি, বসিরুদ্দি, পাঁচু মোড়ল, নিজনি নভ্‌গরদের দিকে চলেছে কেন?

মহাভারতের পরেই উয়োর অ্যাণ্ড পীস্!

তুর্গেনেফ দস্তেয়েফস্কির মতো প্রত্যেক চরিত্রের গোপনতম অন্ধকারে বিদ্যুল্লেখা দিয়ে আলোকিত করতে চান না। তার কারণ বোধহয় তুর্গেনেফ নখ্-শির, আপাদমস্তক ভদ্রলোক। কোনো ভদ্রলোক পরিচিত অপরিচিত কারও গোপন চিঠি পড়ে না—হাতে পড়লেও, কারও হাতে ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও। ঠিক তেমনি তার চরিত্রের গোপন দুর্বলতা তার অজানাতে সে জানতে চায় না, প্রকাশ করতে তার মাথা কাটা যায়—সে তো দুশমনের কাজ, গোয়েন্দার ব্যবসা। ভদ্র তুর্গেনেফ তাঁর নায়কনায়িকার দিকে তাকান শিশুর মতো সরল চোখে, তারা কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে যতখানি আত্মবিকাশ করে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট, তাঁর পক্ষে সেই যথেষ্ট। শার্লক হোম্‌সের মতো আতশী কাচ দিয়ে তিনি তার জুতোর দাগ পরীক্ষা করেন না, পোয়ারোর মতো তাকে ক্রস-এগজামিনেশনের ঠেলায় কোণ-ঠাসা করে অট্টহাস্য করে ওঠেন না, 'ধরেছি, ধরেছি, তোর গোপন কথা কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবি, বল্!'

অথচ শিশুর কাছে কেউ কোন জিনিস গোপন রাখে না। কবি মাত্রই শিশু। তার চোখে ছানি পড়েনি। প্রতিমুহূর্তে সে এই প্রাচীন ভুবনকে দেখে নবীন রূপে।

রুশদেশে পুশ্‌কিনের পর যদি কোনো কবি জন্মে থাকেন, তবে তিনি তুর্গেনেফ। তলস্তয় কবি স্রষ্টিকর্তা হিসেবে, আবিষ্কর্তারূপে, আর তুর্গেনেফ কবি অন্য অর্থে। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কুৎসিত, কিংবা যার দিকে কারও দৃষ্টি যায় না এসব-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিত্ব দিয়ে। তিনি অন্য কবির মতো অবাস্তবকে বাস্তব করেন না, বাস্তবকে অবাস্তব করেন না। বাস্তব অবাস্তব দুইই তাঁর কবি-মনের স্পর্শ পেয়ে আপন আপন সীমা ছাড়িয়ে তৃতীয়

সত্তায় পরিণত হয়। ঘৃত-প্রদীপ শুষ্ক কাষ্ঠ দুইই তাঁর কবিত্বশিখার পরশে আগুন হয়ে জলে ওঠে। কিংবা বলব, শীতের শিশির যেমন তার শুভ্র পেলব আস্তরণ দিয়ে মধুর করে দেয় সদ্য-ফোটা ফুলকে, শুকনো পাতার অঙ্গ থেকে ঘুচিয়ে দেয় তার সর্ব কর্কশতা। ওপারের ঝাউবন, এপারের কাশ, ঘাস, সর্বোচ্চ শাল বকায়ন থেকে আরম্ভ করে রাস্তার পাশের নয়ানজুলি—সবাই যেন সূক্ষ্ম মসলিনের অঙ্গাভরণ পরে সৌন্দর্যের গণতন্ত্রে কৌলীন্য পেয়ে গিয়েছে।

এই কবিত্বপ্রতিভাকেই হিংসা করতেন দস্তেয়ফস্কি, তলস্তয়, নেক্রাসফ ত্রিমূর্তি। নেক্রাসফ স্বয়ং কবি, কিন্তু তিনি জানতেন যে-জিনিসের পরশ পেয়ে শুকনো গদ্য গান হয়ে নেচে ওঠে সেইটির পূর্ণ অধিকার আছে একমাত্র তুর্গেনেফের। আঙ্গিকের উপর এ রকম অখণ্ড অধিকার ত্রিমূর্তির কারও ছিল না। তাঁদের কোনো বিশেষ রচনা হয়ত তুর্গেনেফের রচনা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের, কিন্তু তুর্গেনেফ তাঁদের শ্রেষ্ঠতম রচনাকে তাঁর আঙ্গিকের স্পর্শ দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রচনা করে দিতে পারতেন। দস্তেয়ফস্কি তলস্তয় যেন লিখেছেন কবিতা। তুর্গেনেফ যে-কোনো মুহূর্তে তার যে-কোনো একটিকে সুর লাগিয়ে গানের রূপ দিয়ে দিতে পারতেন। আর তুর্গেনেফের প্রত্যেকটি রচনা যেন গান, তার গায়ে আর হাত দেবার উপায় নেই—তা সে গানের মূল্য কবিতার চেয়ে কম হক আর বেশীই হক।

সে-যুগে ভাষা, ছন্দের রাজা ছিলেন ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক ফ্লবের। তাঁর শিষ্য এবং মানসপুত্র মপাসাঁ তখনও গুরুর মজলিসে আতরদান, গোলাপ-পাশ এগিয়ে দেন। তুর্গেনেফ ফ্লবেরের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফ্লবেরকে চিঠি লেখার সময় মপাসাঁ লেখেন 'গুরুদেব', তুর্গেনেফকে লেখার সময় লেখেন, 'গুরু এবং সখা'। ফ্লবেরের আকস্মিক মৃত্যুতে মপাসাঁ যখন শোকে অভিভূত হয়ে অন্ধের মতো এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছেন তখন তুর্গেনেফ শেষবারের মতো দেশের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েছেন রুশে। মপাসাঁ তাঁকে চিঠি লিখে খুঁজেছেন সান্ত্বনা। লিখেছেন, 'জীবনের সব কটি আনন্দের দিনও তো আমার এই দুঃখের দিনটার ক্ষতিপূরণ করতে পারছে না।'

তার তিন বছর পর গত হলেন তুর্গেনেফ।

এবারেও হয়ত তিনি কোনো সাহিত্যিক বন্ধুকে চিঠি লিখে সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন। তখনকার দিনের ফ্রান্সের সব বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গেই তুর্গেনেফ, ফ্লবের, মপাসাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ভিক্তর হু (য়ু) গো, এদমোঁ দ গঁকুর, এমিল জোলা, আলফঁস দদে এঁদের কাউকে হয়ত তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু আমার

মনে হয়, রুষের গত হলে শোক নিবেদন করা যায় তুর্গেনেফকে, কিন্তু তুর্গেনেফ গত হলে লেখা যায় আর কাকে? বঙ্কিমের মৃত্যু-সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে হয়ত সান্ত্বনার বাণী চাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গত হলে বাঙালী জানাবে কাকে?

মপাসাঁ এর অনেক আগেই ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকায় তুর্গেনেফ সম্বন্ধে প্রশস্তি লিখেছিলেন। এবারে তিনি যেটি লিখলেন, সেটি বড়ই করুণ। মপাসাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাবলীতে এ-দুটি থাকার কথা কিন্তু আজ যখন মপাসাঁকেই লোকে স্বীকার করতে চায় না—যদি বা করে তাও তাঁর তথাকথিত অশ্লীল গল্পের জন্য—তখন তাঁর প্রবন্ধ পড়তে যাবে কে? তবু বলি আনাতোল ফ্রাঁসের রম্য-রচনাকে যদি সত্য ও সুন্দরের অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় সঙ্গম বলে ধরা হয়, তবে সে দুটির উৎস খুঁজতে হবে মপাসাঁর রচনায়। তাঁর ছোটগল্পের সর্বত্র-পরিচিত শৈলীতেই সেগুলো লেখা। ছোট ছোট শব্দ, ছোট ছোট বাক্য আর তার মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দীর্ঘায়তন দীর্ঘকলেবর উদ্দাম উত্তাল শৈলধারার মতো দ্রুতগামী বাক্যবিন্যাস। মন্দাক্রান্তার পাঁচটা হ্রস্বর পর দুটো দীর্ঘ এলে যে-রসের সৃষ্টি হয়।

এর অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সারাংশ নিবেদন করি।

"রুশ দেশের মহান ঔপন্যাসিক ইভান তুর্গেনেফ ফ্রান্সকে আপন দেশরূপে বরণ করেছিলেন। এক মাস অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি গত হয়েছেন।

"এ-যুগের অত্যাশ্চর্য লেখকদের তিনি অন্যতম। সঙ্গে সঙ্গে সাধু, সৎ, অকপট ও বন্ধুবৎসল সমাজের তিনি ছিলেন সর্বাগ্রণী। এ রকম লোকের দেখা মেলে না।

"তাঁর বিনয় ছিল আত্মাবমাননার কাছাকাছি; কাগজে তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু লিখলে তিনি তা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। একাধিকবার তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ প্রশস্তি সংবলিত রচনা তাঁকে যেন মর্মাহত করেছে; কারণ তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী হতেন না যে, শুদ্ধ সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে রচনা লেখা হক। সাহিত্য কিংবা কলা-সমালোচনাকে পর্যন্ত তিনি প্রগল্‌ভ বাক্যবিন্যাস বলে মনে করতেন। একবার কোনো এক সাহিত্য-সমালোচক তাঁর একখানা বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর জীবন নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাতে তিনি রীতিমত আহত হয়েছিলেন। তাঁর সে বেদনা বোধে ছিল লেখকের ব্রীড়া—শুদ্ধ বিনয় তার কাছে নতমস্তক হয়।

"আজ গত হয়েছেন এই মহান পুরুষ; তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু নিবেদন করি।

"প্রথমবার তাঁকে দেখি গুস্তাফ ফ্লবেরের পার্টিতে।

"দরজা খুলতে ঘরে ঢুকলেন দৈত্য বিশেষ। রুপালী মাথা—রূপকথায় যাকে বলে রজতশির। লম্বা-লম্বা সাদা চুল, রুপালী চোখের পাতার লোম আর বিরাট সাদা দাড়ি—সত্যিই যেন খাঁটি রুপোর অতি মিহিন তার দিয়ে তৈরী। ঝকঝক চকচক করছে, প্রতিটি রশ্মিকণা যেন তার উপর থেকে ঠিকরে পড়ছে। আর সেই ধবলিমার মাঝখানে শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। নাকচোখ যেন একটু বড্ড বেশী ধারালো। সত্যিই যেন বরুণদেবের শির—চতুর্দিকে ধবল জলের ঢেউ তুলেছেন—কিংবা আরও ভালো হয়, যদি বলি, অনন্তদেব, বিশ্বপিতার মুখচ্ছবি।

"অতি দীর্ঘ দেহ—বিরাট, কিন্তু দেহে মেদচিহ্ন নেই। আর সেই বিশালবপু অতিকায় পুরুষটির চলাফেরা, নড়াচড়া একেবারে শিশুটির মতো—বড় ভীরু ভীরু ভাব। অতি মিষ্ট মৃদু কণ্ঠে কথা বলেন, কেমন যেন মনে হয়, পুরু জিভ শব্দের ভার যেন সইতে পারছে না। কখনও কখনও কথা বলতে বলতে একটু আটকে যান যেন, ঠিক মনের মতো কথাটি ফরাসীতে কি হবে সেটা খোঁজেন আর প্রতিবারেই চমৎকার ঠিক শব্দটি খুঁজে পান। এই সামান্য থমকে যাওয়াটা তাঁর বচন-ভঙ্গীতে লাবণ্য এনে দিত।

"গল্প বলতে পারতেন অতুলনীয় মধুর ভঙ্গীতে। সামান্যতম ঘটনাকে তিনি সেই ভঙ্গীর পরশ লাগিয়ে রসের স্তরে তুলে নিতে পারতেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার মূল্য আমরা ভালো করেই জানতুম কিন্তু আসলে তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন অন্য কারণে। তাঁর চরিত্রের শিশুর মতো সরলতা ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য; এক দিক দিয়ে এই প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন, তাঁর যুগের তাবৎ গুণী-জ্ঞানীকে তিনি চিনতেন, মানুষের পক্ষে যা পড়া সম্ভব তার সব কিছুই তাঁর পড়া ছিল, ইয়োরোপের সব ভাষা আপন মাতৃভাষার মতো বলতে পারতেন অথচ অন্য দিক দিয়ে তাঁর আর পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে যা কিছু অতিশয় সামান্য সাধারণ তারই সামনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক মানতেন, ভাবতেন, এটা হল কি করে?

"সাহিত্য বিচারের সময় তিনি আমাদের পাঁচজনের মতো সবকিছু বিশেষ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হয়ে বিশেষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতেন না। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্য তাঁর খুব ভালো করে পড়া ছিল বলে সর্বসাহিত্যের সমন্বয় করে তারই

বিরাট পটভূমিতে তিনি পৃথিবীর এক প্রান্তে প্রকাশিত একখানা বই তুলনা করতেন অন্য প্রান্তে প্রকাশিত অন্য ভাষায় লিখিত আরেকখানা বইয়ের সঙ্গে। তাই তাঁর সমালোচনা আমাদের কাছে তার বিশেষ মূল্য পেত।

"তাঁর বয়স হয়েছিল, তাঁর সাহিত্যজীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল অথচ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল আধুনিকতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। প্লটের প্যাঁচ আর থিয়েটারী কৌশলে ভর্তি উপন্যাস তিনি দু চোখে দেখতে পারতেন না, তিনি বলতেন, কিছু না, শুদ্ধমাত্র জীবন হবে উপন্যাসের উপাদান—তাতে প্লটের ছলা কৌশল থাকবে না, থাকবে না অসম্ভব অসম্ভব কীর্তিকাহিনী।

"তার মতে উপন্যাস আর্টের সর্বাধুনিক রূপ। গোড়ার দিকে রূপকথার ছলা-কলা তাতে ব্যবহার করা হত এবং উপন্যাস এখনও তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায়নি। নানা রকম রোমান্টিক আর আকাশ-কুসুম কল্পনা উপন্যাসকে এত দিন ধর্মভ্রষ্ট করেছে। এখন আস্তে আস্তে মানুষের রসবোধ শুদ্ধ হতে চলেছে। এখন ওসব শস্তা ছলাকলা বর্জন করে উপন্যাসকে করতে হবে সরল, তাকে জীবনের আর্ট রূপে তুলে ধরতে হবে যাতে করে একদিন সে জীবনের ইতিহাস রূপে গণ্য হতে পারে।

"আজ তাঁর প্রতিভাপ্রসূত কাব্যসৃষ্টির বিশ্লেষণ করা যাবে না—যদিও জানি তাঁর সৃষ্টি রুশ সাহিত্যের সর্বোচ্চ সৃষ্টির সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রিয়তম বন্ধু মহাকবি পুশ্‌কিন্‌, লেরমন্তফ এবং ঔপন্যাসিক গগলের সৃষ্টির পাশাপাশিই তাঁর রচনার স্থান। রুশ দেশ যাঁদের সৃষ্টি চিরকৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে ইনি তাঁদের একজন। ইনি রুশকে দিয়েছেন চিরঞ্জীব সম্পদ, অমূল্য নিধি। ইনি দিয়েছেন এমনই সম্পূর্ণ আর্ট, এমন সব সৃষ্টি যার বিস্মরণ অসম্ভব; তিনি দিয়েছেন এমন এক গৌরব, যে-গৌরবের মূল্য বিচার অসম্ভব, যার আয়ু অন্তহীন এবং রুশ দেশের অন্য সর্বগৌরব সে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। এঁর মতো লোকেই দেশের জন্য এমন কিছু করে যান যার কাছে প্রিন্স বিসমার্ক তুচ্ছ; পৃথিবীর সর্বভূমির সর্বমহাজনের কাছে এঁরা নমস্য হন।"

কিংবা গুলও বলতে পারেন। মহাশয় ভারত সরকার যখন আমাকে কিছুতেই 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মবিভূষণ' জাতীয় কোনো উপাধিই দিলেন না, এবং শেষ পর্যন্ত শিশির ভাদুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মতো ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রকফেলারররা (অর্থাৎ যাঁরা রকে অন্তত এক লক্ষ গুল মেরে লক্ষপতি রকফেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাকে 'গুলম্‌গীর' উপাধি দিলেন!

হালের কথা। বর্ষার ছদ্মবেশ পরে শরৎ নেমেছেন, কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল, রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভিজে জগঝম্প হয়ে তাবৎ 'ফেলাররাই' উপস্থিত, এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তারপর সবাই আপন আপন আপিস-আদালত কারখানা-শুঁড়িখানাতে খবর পাঠালেন, 'কী ভয়ঙ্কর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। বাড়ি থেকে বেরনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কি করি বলুন তো।'

মশাদার এরকম সকরুণ বেদনার গন্ধঢালা আপিস-প্রীতি এর পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। রকে আসতে তাকে বুক ভেজাতে হয়েছে, এখন তার চোখ ভেজা অথচ তার বাড়ি থেকে যে দিকে আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত; অর্থাৎ দু চারটি চিংড়ি সদস্যও আছেন। আবার ফনি-কাকার বয়স ষাট পেরিয়েছে, গুড়গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয়নি। এরা মাঝে-মধ্যে থাকলে আমাদের একটু সামলে-সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদার প্যাঁচটা দেখে টেটেন মারলে ডবল প্যাঁচ। অজন সেনকে বললে, 'অজনদা, আমার আপিসকে ঝপ্‌ করে একটা ফোন্‌ করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁচেছি কিনা।

অজনদা আরো তৈরী মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কি একটা শুনে

আৎকে উঠে বললে, 'কী বললেন? পৌঁছয়নি? বলেন কি মশাই? বড় দুশ্চিন্তায় ফেললেন তো!'

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অজনদার নিজের কোনো ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শান্তমনে সমাহিতচিত্তে কর্তব্য কর্মে মন দিলুম।

অজন বুঝিয়ে বলে, 'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙ্গজেব ঐ আলমগীর নাম। সেই ওজনে আপনি গুলমগীর।'

আমি বললুম 'হাসালি রে হাসালি। এ আর নূতন কি শোনালি? প্রথম আমি পরীস্তানে ছিলুম গুল্-ই-বকাওলী, তারপর লন্ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মুহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালো, ভালো। গুলমগীর। বেশ, বেশ।'

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন কচিৎ-কস্মিন। বললেন 'ল্যাটে—ল্যাটে বুঝলেন।' বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভর্তি। তারই মহামূল্যবান এক ফোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে, স্বর্গের দিকে ঠোঁট দুটি সমান্তরাল করে সেই দুটিকে মুখের ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে 'ভ', 'ঋ'-কে 'ট', 'ড' করে কথা বলেন—অল্পই।

তাঁর এসব কলকায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরের কাগজ হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বললে, 'এবারে আপনি আপনার উপাধি-প্রাপ্তির সম্মানার্থে একটি সরেস গুল ছাড়ুন তো, চাচা।'

মশা বললে, 'কিংবা গাঁজা।'

আমি বললুম, 'যদি ছাড়ি গাঁজার গুল?'

ঘেণ্টু বললে, 'চাচাকে নিয়ে তোরা পারবিনে রে, ছেড়ে দে।' ঘেণ্টুর পাড়াদত্ত নাম ঘণ্টু। আমি নাম দিয়েছি ঘেণ্টু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেণ্টু চর্মরোগের জাগ্রতা দেবী। বিশ্বেস না হলে চণ্ডিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, 'তবে শোন। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোনো সোসিয়ো-পোলিটিকো ইকনমিক স্টাটিসটিকস সংকলন না করে।' সে আজ কাল ঐ নিয়ে মেতেছে।

টেটের নানাবটি কেস পড়ছিল। বললে, 'আপনি কিস্সুটি জানেন না, চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষে স্ট্যাটিস্টিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যি নিত্যি কাগজে দেখতে পান না? আমি আপনার দোরে যাব কেন?'

'তবে শোন্। নিশ্চিন্ত হয়ে বলি।'

পার্টিশনের বছর খানেক পরের কথা। আমার মেজদা ওতর বাংলার কোথায় যেন কি একটা ডাঙর নোকরি করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভিতর কোনো ঝগড়া-কাজিয়া নেই। এই অ্যাদ্দিন বাদে নেহরুজী আর আইয়ুব খান সায়েব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভ-বুদ্ধি এক্তেয়ার করেছেন। তা সে যাকগে।

হিন্দুস্থানের বিস্তর দরদ-ভরা তত্ত্বতাবাশ করে মেজদা শুধলে, "তোদের দেশে গাঁজার কি পরিস্থিতি?"

আমি একগাল হেসে বললুম, "স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।"

মেজদা আশ্চর্য হয়ে শুধালে, "সে কিরে? কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছিনে।"

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল দাদা ছিলিম মেরে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কি করে জানবো? আমি পাষণ্ড বটি,—দাদা ধর্মভীরু, সদাচারী লোক।

বললে, "শোন।"

পার্টিশনের ফলে মেলা অচিন্তিত প্রশ্ন, নানা ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়ালো গঞ্জিকা-সমস্যা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম, স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশা নাকি গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অচৈতন্য হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজ্‌ক্-ই-জাহাঁগীরীতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি শস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজা-বাদশাহের রাজসিক জাত্যভিমানে। সে কথা যাক্।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজার চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এ সব তত্ত্ব জানতুম না—সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরঞ্চ চায়ের খবর কিছুটা রাখি। এসব গুহ্য রহস্যের খবর দিয়ে গাঁজা

ফার্মের ম্যানেজার আমাকে একদিন দুঃসংবাদ দিলে, সে বচ্ছরের গাঁজা গুদোমে পচে বরবাদ হব হব করছে। ইণ্ডিয়াতে চালান দেবার উপায় নেই—অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।"

আমি শুধলুম, "কেন? তুমি নিজে খাও না বলে অন্য লোকেও খাবে না? এ তো বড় জুলুম!"

দাদা বললে, "কী জ্বালা! আমি শ্রীঘরবাস পছন্দ করিনে; তাই বলে আমি জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি তুই একটি চাইল্ড প্রডিজি—ওয়াণ্ডার চাইল্ড—চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞানগম্যি হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়েসেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।"

আমি চটে গিয়ে বললুম, "আর তুমি বিয়াল্লিশে।"—দাদা আমার চেয়ে দু'বছরের বড়।

দাদা বললে, "তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।"

রকফেলারদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এসব মাইনর বর্ডার ইনসিডেন্ট আমাদের ভিতরে কালে-কস্মিনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় 'আকাশ-বাণী', 'ঢক্কা-ডিংডমে' পৌঁছবার পূর্বেই।'

অজনদা শুধোলে, 'ঢক্কা ডিংডমটা কি চাচা?'

'ডিংডম্' মানে জগঝম্প, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরিজি 'টম্‌টম', 'টমটমিং' শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতার কেন্দ্র। তারপর শোন:

দাদা বললে, "ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ভারতের ষাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজার অভাবে তাঁদের নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্মচিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে—"

আমি গোশ্‌শা করে বললুম, "দেখো দাদা, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মস্করা করো—"

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বললে, "দেখ ভাই, তুই কখনো দেখেছিস যে আমি কাউকে নিয়ে—"

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, "থাক্ থাক্। তুমি বলো।" দাদার ঐ গলাটা আমি বড়ই ডরাই। ওটা দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাফ করবার জন্য তৈরী। চশমার পরকলা দুটো পুঁছে নিয়ে বললে, "পূর্বেই বলেছি, পার্টিশনের ফলে বিস্তর অভাবিতপূর্ব সমস্যা দেখা

ছিল—এটা তারই একটা। পার্টিশনের পূর্বে সান্তাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে অক্লেশে, ব্যাঙালোরের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালো এক দুশমন্। জিনীভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে—কল্যাণ না কচু—তার সার মর্ম এই; আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশী করতে পারো, যত খুশী ততো আফিঙ ফলিয়ে বিক্রি করতে পারো, গাঁজা চালাতে পারো—কিন্তু মনে রেখো, আপন দেশের চৌহদ্দীর ভিতর। এক্স্‌পোর্ট করতে গেলেই চিত্তির। তখন জিনীভার অনুমতি চাই। যেমন মনে কর, ফিনল্যাণ্ড জিনীভার মারফতে তোদের কাছে চাইলে দু'মণ আফিঙ—ওষুধ বানাবার জন্য। জিনীভা সন্দেহের গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্যে. সত্যি ওষুধ বানাবার জন্য ফিনল্যাণ্ডের অতখানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ও'র খানিকটে আক্রা দরে বাজারে বিক্রি করে, দেশের লোককে আফিঙখোর বানিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিতে চায়। কারণ কোনো কোনো দেশ নাকি বিদেশের ওষুধ-বানানেওলাদের সঙ্গে সড় করে ওষুধের অছিলায় বেশী বেশী হশীশ, ককেইন রপ্তানি করে সে সব দেশের বহু লোকের সর্বনাশ করেছে। আইন-গুলো আমি পড়ে দেখিনি, তাই ঠিকঠিক বলতে পারবো না—নির্যাসটি জানিয়েছিল, গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার। এখন নাকি জিনীভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাঠানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত হল আরেক সঙ্কট।

গেল বছরের গাঁজাতে গুদোম ভর্তি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা ক্ষেতে তৈরী। তুলে গুদোমজাত করতে হবে। নূতন গুদোম এক ঝটকায় তৈরী করা যায় না—শেষটায় হয়তো জিনীভা কোনো পারমিটই দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোধিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল' "গেল বছরের গাঁজা পোড়াও—"

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা-রসিক নয়। তবু সবাই—টেটেনদি ছাড়া—এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠলো। খাই আর না ই খাই, একটা ভালো মাল বরবাদ হতে দেখলে কার না দুঃখ হয়? রায়টের সময় পার্ক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্‌স পাস্ত্রীকে পর্যন্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্টিশিয়ান টেটেন বললে, 'আপনারা এতে এমন কি নূতন শোক পাচ্ছেন ? মার্কিনরা যে দু'দিন অন্তর অন্তর অঢেল গম লিটুরিলি অ্যাণ্ড মেট্‌ফরিক্লি দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয়, সে বুঝি জানেন না ?' টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরিজিতে এম এ। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগরেট ধরিয়ে বললুম, 'তারপর দাদা বললে, "গুদোমেতে নূতন মাল পোরা হবে। ম্যানেজারকে বললুম, আমি অমুক দিন যাবো, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললুম না। সেই যে—তুই জানিস নাকি ? বড়দা তোকে বলেছেন, তিনি যখন জাপানী বোমার সময় ট্রেজারি অফিসার ছিলেন তখন হুকুম এল, জাপানী বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ কারেন্সি নোট পুড়িয়ে ফেলবে ? ভাইজাগ না কোথাকার এক সুবুদ্ধিমান একটি মাত্র বোমা পড়া মাত্রই সরকারকে খবর দিলে সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর দু'বছর বাদে, তাজ্জবকী বাৎ, বাজারে সে সব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায়নি। সরিয়ে ফেলেছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলাও ঐ যদি না হয়।

আগে ভাগে দিনক্ষণ দেখে, অর্থাৎ টুর প্রোগ্রাম যথা-যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে, বেরলুম গাঁজা পোড়াতে।"

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, 'কি বললে ?"

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বললে, "হ্যাঁ তাতো বটেই। 'গাঁজা পোড়ানো' কথাটার অর্থ 'গাঁজা খাওয়া'ও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগরেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বললেন, 'জানিস, সিগরেট মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু'। সে তখন শান্তকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাইতো ওকে পোড়াতে যাচ্ছি।'

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গাঁয়ের বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে গাঁজা পোড়ানো দেখবেন বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা-পাতা পোড়ানোতে এমনকি তফাত যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হবে ? তা সে যাকগে।

হদো হদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মাঠের মধ্যিখানে রাখা হল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজারই মুখাগ্নি করলে। সে-ই তার জনক—একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলোমেলো। গাঁজার ধুঁয়ো ক্ষণে এদিকে যায়, ক্ষণে ওদিকে যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড! পাতা পোড়াবার সময় যেদিকে ধুঁয়ো যায় মানুষ সেদিক থেকে সরে যায়। আজ দেখি উল্টো বাৎ। জোয়ান-বুড়ো, মেয়েমদ্দে—হ্যাঁ, কয়েকটি মেয়ে-ছেলেও ছিল—ছোটে সেদিকে।

আর সে কী দম নেওয়ার বহর! সাঁই সাঁই শব্দ করে সবাই নাভিকুণ্ডলী পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দন-কাননের পারিজাত-পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই—অন্তত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস—'আঃ, আঃ'। কেউ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে দু'হাত রেখে, আকাশের দিকে আকর্ণব্যাদনে মুখে তুলে নাসা-রন্ধ্র স্ফীত করে নিচ্ছে এক একখানা দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর 'আঃ—!' শব্দ। কেউ বা মাটিতে বসে ক্যাবলাকান্তের মতো মুখ হাঁ করে আস্য মার্গ দিয়ে যৌগিকধুম গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ হাওয়া ওলটালো। তখন পড়িমড়ি হয়ে সবাই ছুটলো সেদিকে। আমি, ম্যানেজার সেরেশতাদার ততোধিক পড়িমড়ি হয়ে ছুটলুম অন্যদিকে। দু'একটি চাপরাশী দেখি মনস্থির করতে পারছে না। তাদের আমি দোষ দিইনে।

ভেবে দেখ, পৃথিবীতে এ-ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছে? গাঁজা তো আর কোথাও ফলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে একচ্ছত্র গঞ্জিকাযজ্ঞ। চতুর্দিকে গরীব দুঃখী বিস্তর। এক ছিলিমের দম বাজারে কিনতে গেলে এদের দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ তাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ বাতাস টৈটম্বুর করে। হয়ত ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোদের কোনো এক ঔপন্যাসিক নাকি সদর রাস্তায় মদের পিপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে? আমি তার ট্রেলার বাইস্কোপে দেখেছি। কিছু না। ধুলোখেলা। সেখানে সবাই করছে মালের জন্য ছুটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিরগা-জলসার-জনসমাজ দিকনির্ণয় যন্ত্রের অষ্টকোণ চষে ফেলছে—ধুঁয়ো যখন যেদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'জাগ্রত ভগবানকে' ডেকেছিলেন তাঁকে 'জনসমাজ-মাঝে' ডেকে নেবার জন্যে? আমি পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে—আল্লাতালা যেন এই আমামুল্লাস, এই 'জনসমাজ' থেকে আমাকে তফাত রাখেন।"

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গম্ভীর রাশভারী প্রকৃতির লোক, চোখেমুখে কোনো রকম ভাব প্রকাশ করে না, অবশ্য দরদী লোক বলে মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদুহাস্য দেখা যায়—যা-ই হোক, যা-ই থাক, আমার মতো ফাজিল-পঞ্চানন নয়। কোটপাতলুন তুর্কী টুপি পরা সেই লোক খনে এদিক খনে ওদিক ধাওয়া করছে টুপির ফুন্না বা টাসেল চৈতনের মতো খাড়া হয়ে এদিক ওদিক কম্পমান—এ দৃশ্যের কল্পনা মাত্রই বাস্তবের বাড়া।

দাদা বললে, "তুই তো হাসছিস। আমার তখন যা অবস্থা। শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম্ তাজ্জিম্ করতে আরম্ভ করেছে। এত হুটোপুটি সত্ত্বেও ঘিলুতে খানিকটে ধুঁয়ো ঢুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, কি রকম যেন চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব। তারপর দেখি, ম্যানেজারটা আমার দিকে কি রকম বেয়াদবের মতো ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে। কিংবা আমার। অথবা উভয়ের।

আর এ-স্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জীপে উঠলুম। সেও এক বিপদ। দেখি দু-খানা জীপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু হুবহু একই রকম। কোনটায় উঠি? শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মতো কে একজন দাঁড়িয়ে হুবহু আমারই মতো, তার টুপির ফুন্নাটি পর্যন্ত। দুজনাতে দুই জীপে উঠলুম।"

আমি বললুম, "দুটো জীপ না কচু।"

দাদা বললে, "বুঝেছি, বুঝেছি. তোকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। শান্ত হয়ে শোন। তারপর গাড়ি যায় কখনো ডাইনে ঢাকা, আর কখনো বাঁয়ে মতিহারী। তবে কি ড্রাইভারটা—? সে তো সর্বক্ষণ আমারই পিছনে ছিল। তারপর দেখি সেই অন্য জীপটাও ঢাকা মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তারপর দেখি চারটে জীপ। সেও না হয় বুঝলুম। কিন্তু তারপর, মোশয়, সে কী কাণ্ড। চারখানাই উড়তে আরম্ভ করল।"

আমি শুধালুম, "উড়তে?"

"হ্যাঁ উড়তে। জীপটাই তো ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে। ধুঁয়ো খেয়েছিল আমাদের চেয়েও বেশী।

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙলোয় পৌঁছলুম।

ভাগ্যিস বেশী ধুঁয়ো মগজে যায়নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি তোর ভাবী। আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকালেন। বাপ্‌স্। তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে—কিন্তু কী কাঠিন্য কী দার্ঢ্য সে কণ্ঠে—শুধালেন, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?' আমি কিছু বলিনি।"

দাদা থামলেন।

আমি আড্ডাকে বললুম, 'আমার ভাবী সাহেবা অতিশয় পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বেকৎ নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবী টপকান। শমস্থল্-উলেমার মেয়ে।'

রক শুধালে, 'ওটার মানে কি চাচা?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিত-ভাস্কর। তোদের মহামহোপাধ্যায়ের অপজিট্ নাম্বার।'

রক শুধালে, 'তারপর?'

আমি বললুম, 'তদনন্তর কি হল জানিনে। বৌদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তাও বলতে পারিনে, কারণ ঠিক সেই সময়ে ভাবী সায়েবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপরতী পরোটা ও দেখতে বজ্রের মতো কঠোর খেতে কুসুমের মতো মোলায়েম শব্‌ডেগ্‌ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনীটি অনাহারে মারা গেল।'

মশাদা বললে, 'বিলকুল্ গুল্।'

আমি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললুম, 'সাকুল্যে। তাই না বলেছিলুম, গাঁজার গুল।

অর্থাৎ গুলের রাজা গুলমর্গীর তোরা আমাকে আজ ঐ টাইটিলটি দিলি না॥'

১৯৫১

হরিনাথ দে'র স্মরণে

বহু ভাষা শিখতে পারলে বহু সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার মারফতে অনেক সভ্যতা, বিস্তর সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়—এ সব কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, বাঙালী ছেলেকে বাধ্য হয়ে অন্তত তিনটে ভাষা শিখতে হয়—বাঙলা, ইংরিজি এবং সংস্কৃত (কিংবা আরবী অথবা ফার্সী)। হয়ত তাকে হিন্দীও শিখতে হচ্ছে, কিংবা অদূরভবিষ্যতে শিখতে হবে। এ অবস্থায় আমি যদি প্রস্তাব করি, আরো গুটি দুই শিখলে হয় না? তাহলে ছেলেদের হাতে আমার প্রাণ বিপন্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা—বাঙলাদেশে না থাকলেও এ খবরটি বিলক্ষণ রাখি। বিশেষতঃ এই পুজোর বাজারে,—মানুষ যখন বলির পাঁঠার সন্ধানে থাকে।

তাই হট্টগোল আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই আমি নিবেদন করছি, এ প্রস্তাবটি শুধু তাদেরই জন্য, যারা বুঝে গিয়েছে যে সংস্কৃতে তারা বিদ্যাসাগর হতে পারবে না, ওটাকে নিতান্ত পরীক্ষা পাশের জন্য যেটুকু সম্মান দিতে হয় তাই দেবে, বাঙলা তো মাতৃভাষা, এবং ইংরিজির চর্চা ততটুকুই করবে যতটুকু পাশের পর চাকরির জন্য নিতান্তই প্রয়োজন। এই সংজ্ঞা থেকেই সুচতুর পাঠক বুঝে যাবেন যে, আমি মোটামুটি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার ছেলেদের কথাই ভাবছি। অর্থাৎ এরা ক্লাসে (সেভেন-এইট) যে রকম পড়িমরি হয়ে তিনটে ভাষার পিছনে ছুটতো এখন আর তা করে না। বিশেষতঃ গোটাপাঁচেক ইয়ার্লি আর খান-দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করে এরা ভাষা না শিখে কি করে তার পরীক্ষা পাস করতে হয় সে 'বিদ্যায়' বিলক্ষণ রপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এতখানি বলার পরও যদি কেউ লেমনেডের বোতল খোঁজে তবে আমার দ্বিতীয় নিবেদন, গোটা দুই ভাষা শিখলে চাকরি জোটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। হল? এখন তবে আশা করতে পারি, পাঠক বোতলটি আমার মাথায় না

ফাটিয়ে সেটার ভিতরকার জিনিস বরফের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করবেন।

দয়া করে সেটিও করবেন না ; কারণ আমি যে প্রস্তাব করতে যাচ্ছি সেটা লটারির টিকিট কাটার চেয়ে মাত্র এক চুল ভালো—এই যা। ইংরিজিতে একেই বলে 'চেসিং দি ওয়াইল্ড গীস্'—কিন্তু চাকরির বাজারে বাঙালী ছেলের সামনে যখন কোনো 'গূস্'ই নেই তখন আশা করতে পারি সে ঘরের না খেয়ে বনের হাঁস তাড়া করতে আপত্তি করবে না। বুঝিয়ে বলি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভাষা শেখার কোনো অর্থকরী মূল্য এদেশে ছিল না। স্বরাজ লাভের পর অবস্থাটা বদলেছে। আমরা নানা দেশে আমাদের রাজপ্রতিনিধি, রাজদূত, হাই-কমিশনার, কন্সালজেনারেল, কন্সাল, ট্রেড কমিশনার এবং তাঁদের দফ্তরের জন্য কাউনসেলর, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সেক্রেটারি, মিলিটারি আতাশে, ট্রেড আতাশে, প্রেস আতাশে, কেরানী, দোভাষী ইত্যাদি পাঠাচ্ছি এবং দিল্লীর পরদেশী দফ্তর বা ফরেন-অফিসেও ভাষা জাননে-ওলা লোকের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া বেতার-কেন্দ্র ফরাসী, ইরানী, ফার্সী, কাবুল-ফার্সী, আরবী, পশতু, সুহেলী গুর্খালী, বর্মী, ইন্দোনেশী ও চীনা ভাষায়ও প্রোগ্রাম দেন। আমাদের ফৌজী ইস্কুলেও অনেক ভাষা শেখানো হয়।

এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে যে গণ্ডায় গণ্ডায় চাকরি খালি পড়েছে তা নয়, তবু আমার ব্যক্তিগত ধারণা উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান থাকলে যোগ্য লোককে এ তিনটি প্রতিষ্ঠান খাতির করবে। আর পূর্বেই নিবেদন করেছি, আমার এ প্রস্তাব তাদেরই জন্য, যারা চাকরির বাজারে একটুখানি রিস্ক্, রতিভর ঝুঁকি নিতে রাজী আছে।

আমি যে খবরটি দিলুম সেটি কিছুমাত্র নূতন নয়। কারণ প্রায়ই বেকার ছেলেরা এসে আমাকে অনুরোধ জানায় তাদের ফ্রেঞ্চ জর্মন শিখিয়ে দিতে। (এখানেই লক্ষ্য করে রাখুন 'ফ্রেঞ্চ-জর্মনই' বলে, অন্য কোনো ভাষার নাম তোলে না)। আমার সময়ের অভাব, দ্বিতীয়তঃ আমি বাঙলাটাই ভালো করে জানিনে—কাজেই ফরাসী-জর্মনের কথাই ওঠে না, তাই তাদের কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিয়ে বিদেয় দি।

এদের প্রশ্ন করে দেখলুম, এরা জানে না, (ক) কোন্ ভাষার চাহিদা বাজারে কতখানি, (খ) কোন্ ভাষা শক্ত আর কোন্টা নরম, (গ) ভাষা শিখতে হয় কি করে—এবং আরো অনেক কিছুই জানে না।

আমি দোষ দিচ্ছিনে। জানবার সুযোগ দিলে তো তারা জানবে। আর যদি জানতই তবে আজ আমি এ বিষয়ে লিখতে যাবো কেন?

আমাকে এক উত্তম ব্যবসায়ী বলেছিল, 'জিনিস বেচা সোজা, কেনা শক্ত।' আমি তো তাজ্জব। বলে কি? তখন বুঝিয়ে বললে, 'বাজারে ঠিক যে জিনিসের চাহিদা তাই দিয়ে যদি আমি আমার দোকান সাজিয়ে রাখি তবে সন্ধ্যে হতে না হতেই দোকান সাফ হয়ে যাবে। তাই বললুম, বেচা সহজ। কিন্তু আড়তদারদের কাছ থেকে যদি বে-আক্কেলের মতো বে-চাহিদার মাল কিনি তবে সেগুলো দোকানে পচবে, দোকান উঠে যাওয়ার পরও। তাই বললুম, কেনা শক্ত।'

এস্থলেও সেই নীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রথম দেখতে হবে, আপনি কি মাল কিনবেন, অর্থাৎ কোন্ ভাষা শিখবেন।

সবাই বলে 'ফ্রেঞ্চ জর্মন'। এ যেন কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রেঞ্চ ভুবন-বিখ্যাত ভাষা। এককালে ফ্রেঞ্চ না জেনে কূটনীতি মহলে যাওয়া বিনা পৈতেয় ব্রাহ্মণ ভোজে যাওয়ার মতো ছিল। এখনো পৃথিবীর যে কোনো দেশের পাসপোর্টে দেখতে পাবেন দুটি ভাষাতে সব কিছু ছাপা, প্রথমটি তার আপন ভাষা এবং দ্বিতীয়টি ফরাসী। কিন্তু এসব হচ্ছে ঊনবিংশ শতকের কথা। আপনি যদি সেই শতকের চাহিদা মেটাতে চান, তবে মেটান। আপনি যদি একশ' বছরের পুরনো বিজ্ঞাপন-মাফিক চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে চান তো করুন।

তাই প্রথম দেখতে হবে:—এখন, এই মুহূর্তে, চাহিদা কি এবং চাহিদার গতিটা কোন্ দিকে, অর্থাৎ আপনি ভাষাটাষা শিখে দু' তিন বছরে যখন বাজারে নামবেন তখন চাহিদাটা কি হবে?

ভাষার প্রাধান্য তার লোকসংখ্যা থেকে বিচার করা ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনা ভাষা নিন। ইংরাজ, রাশান, চীনা এ তিন ভাষায় কথা বলে পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী লোক এ কথা সত্য, কিন্তু চীনা ভাষায় লোকসংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন তারা সবাই মাত্র একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী। কাজেই ঐ রাষ্ট্রে আমাদের থাকবে মাত্র একটি এম্বেসি। পক্ষান্তরে জর্মন ভাষার অবস্থা বিবেচনা করুন। জর্মন বলা হয় জর্মন রাষ্ট্রে (উপস্থিত সেটিও আবার দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত), অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রে এবং সুইটজারল্যাণ্ডে। এই তিন দেশে আমাদের তিনটি রাজদূতাবাস আছে। তা ছাড়া জর্মন বলা হয়, উত্তর ইটালির টিরোল, ফ্রান্সের আলসেস-

সরেন ও-বেলজিয়ামের অয়পেন অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে যদি কখনো রাজনৈতিক গোলমাল আরম্ভ হয় এবং আপনাকে তার রিপোর্ট লিখতে সেখানে যেতে হয় তবে জর্মন ছাড়া এক পাও এগুতে পারবেন না। এবং সর্বশেষ কথা : জর্মনি অস্ট্রিয়া, সুইটজারল্যাণ্ড বেচে তৈরী মাল ভারত বিক্রি করে কাঁচা মাল। এ সব দেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা দ্রুতগতিতে বাড়তেই থাকবে ; বিস্তর কনস্যুলেট ও ট্রেডকমিশন ক্রমে ক্রমে ওসব জয়গায় আমাদের খুলতে হবে।[১] কিন্তু চীন ভারত সমগোত্রীয়, দুজনেই বেচে কাঁচা মাল, অতএব 'বৈবাহিক' বৈষয়িক কাজ আমাদের চলে না।

আমরা যে স্বার্থ নিয়ে এ আলোচনা করছি তার দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ভাষার গুরুত্ব বিচার অবান্তর। সোভিয়েট রাশা বিরাট রাষ্ট্র কিন্তু ঐ দেশে আছে এবং বহুকাল ধরে থাকবে আমাদের একটি মাত্র রাজদূতাবাস। রাশা আবার মারাত্মক রকমের কেন্দ্রপ্রাণ রাষ্ট্র—মস্কোর নাম বদলে তাকে 'সেণ্টার' নাম দেবার প্রস্তাব ঐ কারণেই একবার হয়েছিল—তাই তার উপরাষ্ট্র যথা, তুর্কোমানিস্তান উজবেকিস্তানে যে আমাদের রাজদূত আস্তানা গাড়বেন তার আশু সম্ভাবনা দেখতে পারছিনে। অবশ্য উত্তম সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য রাশানের মতো ভাষা পৃথিবীতে বিরল।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আরবরা আজ পৃথিবীতে উঁচু আসনে বসে না। তার প্রধান কারণ, তারা নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই আমাদের দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাদের প্রাধান্য বেড়ে গেল। উপস্থিত আরব

(১) এখানে এম্বোস, হাই কমিশন, লিগেশন ইত্যাদির পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে দেওয়া ভালো। এই তিনটিই রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং কূটনৈতিক কাজকর্ম চালায়। এম্বেসি এবং হাই-কমিশন পদমর্যাদায় একই—বৃটিশ ক্রাউনের আওতায় থাকলে এম্বেসির নাম হাই-কমিশন—লিগেশন পদমর্যাদায় ছোট। কনস্যুলেটের কাজ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনমত্তে একাধিক কনস্যুলেট থাকতে পারে—কিন্তু একাধিক এম্বেসি হয় না—এবং সে স্থলে কনস্যুলেট জেন্যুরেলও থাকে। ট্রেড কমিশন কনস্যুলেটের চেয়ে জাতে ছোট—অনেকটা এক্সপেরিমেণ্টাল পোস্ট-অফিসের মতো। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লে তার পদবৃদ্ধি হয়। কোনো কোনো দেশে আমাদের কনস্যুলেট না থাকলে, সেখানকার এম্বেসি-হাই-কমিশন-লিগেশন ঐ কাজও করে থাকে। এই সব তাবৎ প্রতিষ্ঠান আমাদের ফরেন অফিসের তাঁবেতে থাকে।

জাতি এই ক'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত :—ইরাক, সিরিয়া (শাম). লেবানন, হাদ্রামৌৎ, ট্রানস্‌জর্ডন, সউদী আরব, ইয়েমেন, মিশর, সুদান, টুনিসিয়া, আলজিরিয়া মরক্কো, লিবিয়া। তা ছাড়া কুয়েৎ, বাহরেইন, ওমান ইত্যাদি। এদের সব কটি স্বাধীন নয়, কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে আমরা যেদিন অ্যাংলো-আমেরিকান আড়কাটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আড়তদারের কাছ থেকে সোজা পেট্রল কেনবার দুই নম্বরের 'স্বরাজ' পাব সেদিন আরবের আনাচে-কানাচেও আমাদের কনস্যুলেট বসাতে হবে। উপস্থিত, আমার যতদূর জানা, মিশর, সউদী আরব, ইরাকে আমাদের রাজদূতাবাস আছে। এদের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না।

কিন্তু রাষ্ট্রগুলোর এসব 'মেল' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেলাতে গেলে আমরা পুজোর বাজার পেরিয়ে শ্যামা পুজোয় পৌঁছে যাব। তাই সংক্ষেপে বলি, আমার মনে হয়, আমাদের স্বার্থের জন্য উপস্থিত স্পানিশ-ই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। আপনি বলবেন, ঐটুকু দেশ স্পেন—তার ঐ 'ভাঙা নৌকায়' আমাদের কতখানি 'সোনার ধান' ধরবে!

আমি স্পেনের কথা আদপেই ভাবছি না। আমি ভাবছি দক্ষিণ আমেরিকার কথা। সেখানে ডজনখানেক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। তাদের ভাষা স্পানিশ—হিস্পানী। ওদের গুটিকয়েক আমাদের রাজদূতরা বেশ কিছুকাল হস ডেরা গেড়ে বসেছেন। আমার বিশ্বাস সব কটাতে না হোক, বাকী অনেকগুলোতেই ক্রমে ক্রমে আমাদের রাজদূতাবাস বসবে। অতএব আমার সলা যদি নেন তবে স্পানিশ শিখুন।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে অধমের জ্ঞান অতিশয় অপ্রচুর। তবু বলবো, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে এদেরই সঙ্গে আমাদের বাড়বে। সংক্ষেপে তার কারণটা বলি ;—আমেরিকা, ইয়োরোপ এবং রাশা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বলতে গেলে তাদের সম্পূর্ণ অর্থনীতি যুদ্ধ-প্রস্তুতির চতুর্দিকে এমনি কেন্দ্রীভূত করেছে যে তারা কিনতে চায় যুদ্ধের জন্য তাদের সে সব মালের দরকার এবং বেচতে চায় যুদ্ধের জন্য যার প্রয়োজন নেই। আর যুদ্ধ যদি লেগে যায় তবে আপনার অর্ডারগুলো তারা শিকেয় তুলে রাখবে, আপনার কাঁচা মাল বন্দরে বন্দরে পচবে। দক্ষিণ আমেরিকা এসব আওতার বাইরে। ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েই যাবে—আমাদের তৃতীয় 'স্বরাজ' লাভের পর। দশটা রাজদূতাবাস যদি তিনশটা চাকরি দিতে পারে তবে ব্যবসা-বাণিজ্য দেবে তিন হাজার কিংবা ত্রিশ হাজার। আর চাকরি ছেড়ে দিয়ে যদি ভাষার জোরে ব্যবসা চালান তবে তো আর কথাই নেই।

এস্থলে আরেকটি তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ ইঙ্গিত দি। ভাষা শেখার সময় গোড়ার দিকে সমগোত্রের ভাষা শিখে তাড়াতাড়ি ভাষার সংখ্যা বাড়িয়ে নেবেন। উদাহরণস্থলে বলি আপনি বাঙালী. আজ যদি আপনাকে নিছক ভাষার সংখ্যাই দেখাতে হয় তবে আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে অসমীয়া এবং উড়িয়া নিয়ে। এ দুটি ভাষা বাঙলার এত কাছাকাছি যে আপনাকে বেগ পেতে হবে অতি কম। তারপর শিখবেন, হিন্দী, গুজরাতি, মারাঠি, গুরুমুখী। ঠিক ঐ রকমই পর্তুগীজ ইতালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা স্পানিশ ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপনার বাঙলা জানা থাকলে অসমীয়া শিখতে কত দিন লাগার কথা? না হয় তারই ডবল ধরুন স্পানিশ শেখা হয়ে গেলে পর্তুগীজ, কিংবা ফরাসিস্ শিখতে। ঠিক সেই রকম জর্মন ফ্লেমিশ এবং ডাচ্ পড়ে অন্য গোত্রে। একদা ব্রাসেল্স্ শহরে আমি একখানা ফ্লেমিশ খবরের কাগজ কিনে পড়ে দেখি মোটামুটি বক্তব্যটা ধরে ফেলতে পেরেছি—অল্পস্বল্প যা জর্মন জানি তার-ই কৃপায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আপনি অসমীয়া শিশুশিক্ষা কখনো পড়েননি। একখানা অসমীয়া বই নিন। দেখবেন বারো আনা পরিমাণ অনায়াসে বুঝতে পারছেন। কিংবা বেতারে যখন 'অহমীয়া বাতরি' শোনেন তখন কি তার মোটামুটি অর্থ ধরতে পারেন না?

তাই এই * অংশের গোড়াতে ভাষার সংখ্যাবৃদ্ধির যে-কথা তুলেছিলুম সেটাতে ফিরে যাই। অর্থাৎ গুরুর সাহায্যে যদি বিদ্যায়তনে আপনি স্পানিশ আরম্ভ করেন তবে মাস দুই যেতে না যেতেই বাড়িতে, কারো সাহায্য ছাড়া পর্তুগীজ কিংবা ফরাসী আরম্ভ করে দেবেন। ব্যাকরণখানার দু'দশ পাতা ওলটাতে পালটাতেই দেখবেন এক সঙ্গে দুটো ভাষা আয়ত্ত করা কিছুমাত্র কঠিন কর্ম নয়। গোড়ার দিকে কিছুটা গুবলেট হয়ে যাবে সন্দ নেই। কিন্তু কিছুদিন পরে যদি সেটা কাটিয়ে না উঠতে পারেন তবে বুঝবেন ঐ দিকে ভগবান আপনার প্রতি সদয় নন, তখন না হয় লেগে যাবেন মানুষ মারার ব্যবসাতে—যাকে অজ্ঞজন বলে ডাক্তারি, কিংবা রেলকলিশনের পরিপাটি ব্যবস্থা করাতে—যাকে অজ্ঞজন নাম দিয়েছে ইঞ্জিনিয়ারি। কিন্তু নিবেদন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ম্যাট্রিক বড় কঠিন পরীক্ষা। আপনি যদি সেটা পাস করে থাকতে পারেন তবে গোটাতিনেক ভাষা শিখতে পারবেন না কেন?

* প্যারাগ্রাফ

গোত্রবিচারে ফিরে যাই।

১। লাতিন গোত্র—স্পানিশ, ফরাসিস্, পর্তুগীজ, ইটালিয়ান।

২। জর্মন গোত্র—জর্মন, ডাচ্, ফ্লেমিশ।

৩। স্কাণ্ডিনেভিয়ান গোত্র—নরউইজিয়েন, সুইডিশ।

৪। তুর্কী গোত্র—তুর্কী (ওসমানলি তুর্কী, অর্থাৎ টার্কির ভাষা,—তুর্কমানিস্তানের ভাষা, জগতাই তুর্কী। প্রথমটা মুস্তফা কামালের মাতৃভাষা, দ্বিতীয়টা বাবুর বাদশার), হাঙ্গেরিয়ান ও ফিনিশ—কিন্তু এক হলেও শাখাতে বর্ণ-বৈষম্য প্রচুর।

৫। রাশান গোত্র—রাশান, পলিশ, ল্যাটভিয়ান, স্লোভাক ইত্যাদি।

৬। ইরানী গোত্র—ইরানী ফার্সী ও কাবুলী ফার্সী—পার্থক্য সামান্য।

৭। আরবী গোত্র—আরবী, হীব্রু, ইড্ডিশ (অধুনা প্যালেস্টাইনে প্রচলিত প্রাচীন হীব্রুর অর্বাচীন রাষ্ট্রভাষা), আহ্মেরিক (আবিসিনিয়ান ভাষা)।

৮। চীনা গোত্র—চীনা, জাপানী, কোরিয়ান ইত্যাদি।

৯। এছাড়া টিবেটো-বর্মন গোত্রের বর্মী ইত্যাদি। মালয়, থাই, ইণ্ডোনেশিয়ন ইত্যাদি।

অজানাতে এবং জানাতেও ছোট এবং বড় কোনো কোনো ভাষা বাদ পড়ে গেল। তাই নিয়ে শোক করবেন না। উপস্থিত এগুলো শিখে নিন। তা হলে অন্যগুলোর খবর আপনার থেকেই জানা হয়ে যাবে।

এর ভিতর সহজ ১ এবং ৬নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ২ এবং ৩নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ৫ নম্বরের গোত্র, তার চেয়েও কঠিন ৭নং, পারতপক্ষে ৮ নম্বরের পাড়া মাড়াবেন না (অবশ্য জাপানী তেমন শক্ত নয়), ৪ আর ৯ নম্বরের খবর জানিনে, তবে খুব শক্ত হওয়ার কথা নয়।

দুই গোত্রের দু'টো ভাষা এক সঙ্গে শেখা যে খুব কঠিন তা নয়, তবে তার জন্য সৎপ্রতিষ্ঠান ও সৎগুরু প্রয়োজন। এই দু'টির বড়ই অভাব—এই দুঃসংবাদটি যতক্ষণ পারি চেপে গিয়েছিলুম; আর পারা গেল না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই সুসমাচারটিও বিতরণ করছি যে ভারতবর্ষে কোথাও এমন সুব্যবস্থা নেই যে তার পাল্লায় পড়ে আপনি হেরে যাবেন। এই যে আমাদের রাজধানী দিল্লী শহর, যেখানকার লোক কেন্দ্রের নোকরি বাবদে হামেহাল তেজনজর ওকীবহাল, সেখানে যে দু'একটি প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো অতিশয় রদ্দী অথচ টাকা লুটছে এন্তের। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, কলকাতায় নাকি গোটাদুত্তিন প্রতিষ্ঠান আছে

সেখানে বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। খোঁজ করলে দেখবেন, খুড়ো-জ্যোঠার আমল থেকে বাড়িতে দু'চারখানা হ্যূগো, দু'চারখানা মার্লবর পড়ে আছে, কিন্তু ইংরিজি ছাড়া কোনো বিদেশী ভাষা কেউ শেখেননি। আমিও ভূ-ভারতে এমন প্রাণীর সংস্পর্শে আসিনি যিনি ঐসব প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে কলকাতাতে বসে কোনো বিদেশী ভাষা শিখেছেন। তবে ইদানীং অবস্থা একটু ভাল হয়েছে।

অধমের শেষ সাবধান বাণী: সবকটা আণ্ডা একই ঝুড়িতে রাখবেন না —কুল্যে শিন্নি একই দরগায় উজোড় করে দেবেন না। তার সরল অর্থ বি-এ, এম-এ, পাস অবহেলা করে হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বিদেশী ভাষার পশ্চাদ্ধাবন করবেন না। এসব পড়াশুনো বি-এ, এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চালাবেন—আড্ডাটা সিকিটাক কমিয়ে দিয়ে, ফুটবল দেখাটা একটু মুলতুবি রেখে দিয়ে। একদম ছেড়ে দিতে বলবো কেন, তওবা, তওবা, তাহলে আপনার বাঙালীত্বই যে উপে যাবে। ভাষা শিখে পরীক্ষা দিয়ে যদি সেদিকে নোকরি না জোটে তবে বি-এ, এম-এ পাস করে যা করতেন, তাই করবেন। তা হলে অন্তত আমার গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে বলতে পারবেন না, 'তবে রে- , তোর কথায় না— ইত্যাদি।'

॥ ১৯৫৪ ॥

অনুকরণ না হনুকরণ?

আগে ভাগেই বলে রাখছি, এ-লেখা সমালোচনা নয়।

সমালোচনা লেখবার মতো শক্তি—ভুইংলোকে বলে, শক্তির অভাব—আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই। গল্পছলে নিবেদন করি :—

প্রতি রববারে এক বঁড়শে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি মাছ ধরে। বড মাছের শিকারী, তাই ফাতনা ডোবে কালে-কস্মিনে, আকছার রববারই যায় বিন্-শিকারে। তারই একটু দূরে আরেকটা লোক প্রতি রববারে এসে বসে, এবং তামাম দিনটা কাটায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওর মাছধরা দেখে দেখে! দু'জনায় আলাপ পরিচয় নেই। মাস তিনেক পর লোকটার 'আলসেমি' দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর শিকারী একটু বিরক্তির সুরে শুধালে, 'ওহে, তুমি তাহলে নিজেই মাছ ধরো না কেন?'

লোকটা আঁৎকে উঠে বললে 'বাপস! অত ধৈর্য আমার নেই!'

সমালোচনা লেখার ধৈয আমার নেই।

আর কি-ই বা হবে সমালোচনা লিখে? কটা সুস্থ লোক সমালোচনা পড়ে? কটা বুদ্ধিমান মাছ টোপ গেলে? আলগোছে তফাতে থেকে সমালোচনা প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোকর দেয় অনেকেই—অর্থাৎ রোকা পয়সা ঢেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে তখন পয়সার দাম তোলবার জন্য একটু-আধটু খোঁচা-খুঁচি করে। ফলে, চারের রস যত না পেল বড়শির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশী জখম হয়ে "দুত্তোর ছাই" বলে তাস-পাশাতে ফিরে যায়।

সমালোচকরা ভাবেন, পাঠকসাধারণ বোকার পাল। ওরা তাঁদের মুখে ঝাল চেখে বই কেনে। তা হলে আর দেখতে হত না। মারোয়াড়ীরা সস্তায় রাবিশ পাণ্ডুলিপি কিনে পয়সা দিয়ে উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিয়ে রাবিশগুলো খুচকারী (অর্থাৎ খুচরোর লাভে, পাইকারীর পরিমাণে) দরে বিক্রি করে ভুঁড়ি বাড়িয়ে নিতো—ফাও হিসেবে দেশে নামও হয়ে যেত, 'সৎসাহিত্য' তথা 'সমালোচকদের' পৃষ্ঠপোষকরূপে।

আমার কথা যদি চট করে বিশ্বাস না করতে পারেন তবে চিন্তা করে দেখুন, আপ্তবাক্য নিবেদন করেছি, 'পয়সা দিয়ে সমালোচনা লেখানো যায়, পয়সা দিয়ে কবিতা লেখানো যায় না।' নাহলে আমেরিকায় ভালো কবির অভাব হত না। সমালোচকের অভাব সেখানে নেই এবং বর্ণে গন্ধে তাঁরা অস্মদ্দেশীয় সমালোচকদেরই মতো।

পলিটিশিয়ানরাও ভাবেন প্রোপাগাণ্ডিস্ট (অর্থাৎ সমালোচক)-দের দিয়ে নিজ পার্টির প্রশংসা কীর্তন করিয়ে নিয়ে বাজিমাৎ করবেন। কিন্তু ভোটার—ভোটার যা পাঠকও তা—আহাম্মুখ নয়, যদিও সরল বলে সত্য বুঝতে তার একটু সময় লাগে। না হলে আওযামীরা মুসলিম লীগকে কস্মিন্‌কালেও হটাতে পারতো না।

আমিও মাঝে-মধ্যে সমালোচনা পড়ি, কারণ আমিও আর পাঁচজন পাঠকের মতো পয়সা ঢেলেই কাগজ কিনি। তবে আমার পড়ার ধরন স্পানিয়ার্ডদের রুটি খাওয়ার মতো। শুনেছি, স্পানিয়ার্ডরা বছরের পয়লা দিন গির্জায় উপাসনা সেরে এসে এক টুকরো রুটি চিবোয়—কারণ প্রভু যীশু খৃষ্ট তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, 'আর আমাদের অদ্যকার রুটি দাও'। খানিকটে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে বলে, 'তওবা. তওবা, সেই গেল বছরের রুটিরই মতো যাচ্ছেতাই সোয়াদ।' তারপর বছরের আর ৩৪৬ দিন সে খায় কোর্মা-কালিয়া কটলেট মমলেট। আমিও সমালোচনার শুকনো রুটি বছরের মধ্যে চিবুই মাত্র একটি দিন এবং প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম হয়, সমালোচনার স্বাদ-গন্ধ সেই গেল বছরের মতো—এক বছরে কিছুমাত্র উন্নতি করতে পারেনি।

কথাটা যে ভাবে বর্ণনা করলুম, তাতে পাঠকের ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু মোটেই তা নয়। অভিজ্ঞতাটা পাঠকসাধারণ মাত্রেরই নিদারুণ নিজস্ব। অবশ্য সমালোচকদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা একে অন্যের সমালোচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকেন। কেন পড়েন? জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য? রাম রাম! স্রেফমাত্র দেখবার জন্য কে তার মতে সায় দিয়েছে, কে দেয়নি, এবং সেই অনুযায়ী দল পাকানো, ঘোঁট বাড়ানো, শক্তি সঞ্চয় করে রুটিটা আণ্ডাটা—থাক্‌।

অবশ্য সমালোচকদের সমালোচনা করার কুবুদ্ধি যদি আমার কখনো হয়—এতক্ষণ যা করলুম সেটা তারই সেতার বাঁধা মাত্র—তা হলে সেটা আপনাদেরই

পাতে নিবেদন করবো। তবে ধর্মবুদ্ধি তখনো আপনাদের সাবধান করে দেবে, ও-লেখাটা না পড়তে।

* * * *

মূল বক্তব্যে আসি। ইদানীং আমি বাঙলার বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং বাঙলার বাইরে থেকেও কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। এঁরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, 'কি প্রকারে ভালো লেখক হওয়া যায়?'

প্রথমটায় উল্লসিত হয়েছিলুম। যাক, বাঁচা গেল। বাঙলাদেশ তা হলে স্বীকার করেছে, আমি ভালো লেখক। এবারে তা হলে কলকাতা-দিল্লীতে গিয়ে কিঞ্চিৎ তদ্বির করলেই, দু'চারটে প্রাইজ পেয়ে যাবো, লোকসভার সদস্য-গিরি, কলচেরল ডেলিগেশনের মেম্বরী, এ-সবও বাদ যাবে না। বিদেশ যাবার সুযোগও হয়ে যাবে—বিলেত দেখার আমার ভারী শখ, অর্থাভাবে এতদিন হয়ে ওঠেনি। ইংরিজিটা জানিনে, এতদিন এই একটা ভয় মনে মনে ছিল। এখন বুলগানিন, চু-এন-লেইয়ের কল্যাণে সেটাও গেছে। এঁরা ইংরিজি না জেনে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু হায়, এত সুখ সইবে কেন? আমার গৃহিণী নিরক্ষরা—টিপসই করে হালে আদালতে তালাকের দরখাস্ত করেছেন। তালকটা মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আছেন। তাঁর কাছে চিঠিগুলো পড়ে নিজের মূল্য বাড়াতে গিয়েছিলুম। তিনি করলেন উল্টো অর্থ। সেটা আরো সরল। ব্যবসাতে যে দেউলে হয়েছে, তারই কাছে আসে লোক সলার সন্ধানে; ফেল-করা ছেলে পাস-করার চেয়ে ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়।

এর উত্তর আমি দেব কি? গৃহিণী যে কটা গল্প জানেন সব কটাই আমার সঙ্গে টায় টায় মিলে যায়। মনে হয় আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর-শাশুড়ী ছেলেবেলা থেকে তাঁকে এই তালিমটুকুই শুধু দিয়েছেন, স্বামীর গোদা পায়ের গোদটি কি প্রকারে বারে বারে দেখিয়ে দিতে হয়। অবশ্য তার জন্য যে বিশেষ তালিমের প্রয়োজন হয় সেটা অস্বীকার করলেও চলে। ওটা তাদের বিধিদত্ত জন্মলব্ধ অশিক্ষিত পটুত্ব। যে সব সমালোচকদের কথা পূর্বে নিবেদন করেছি, তাদের বেলাও এই নীতি প্রযোজ্য।

ব্রাহ্মণীর আপ্তবাক্য আমি মেনে নিয়েছি। তিনি তালাকের দরখাস্তটি উইথড্র করেছেন—শুনে দুঃখিত হবেন।

* * * *

শঙ্করাচার্য দর্শনরণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে বলেছিলেন, 'সাংখ্যমল্লকে আহ্বান করো। সেই মল্লদের অধিপতি। তাকে পরাজিত করলে অন্যান্য শফরী-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অযথা কালক্ষয় করতে হবে না।' আমি শঙ্কর নই। তাই সবচেয়ে সরল প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

প্রশ্নটি এই: 'মপাসাঁর ছোট গল্প অপার আনন্দ দেয়, কিন্তু তাঁর অনুকরণ-কারীদের গল্প এত বিস্বাদ কেন? অপিচ, মপাসাঁ ছোট গল্প লেখার যে কাঠামো তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন তার অনুকরণ না করে গল্প লিখিই বা কি প্রকারে?'

যাঁরা সঙ্গীত আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই জানেন, ওস্তাদ যে ভাবে গান গান, তারই হুবহু অনুকরণ করতে হয় ঝাড়া দশটি বছর ধরে। ভরতনৃত্য শিখতে গেলে মীনাক্ষিসুন্দরম্ পিল্লের নৃত্য অনুকরণ করতে হত ততোধিক কাল। স্যাকরার শাগরেদকে কত বছর ধরে একটানা গুরুর অনুকরণ করে যেতে হয়, তার ঠিক ঠিক খবর আমার জানা নেই। ভারতবর্ষে এই ছিল রেওয়াজ।

সাহেবরা এ দেশে এসে বললে, 'এত বেশী অনুকরণ করলে নিজস্ব সৃজন-শক্তি (অরিজিনালিটি) চাপা পড়ে যায়। ফলে কোনো কলার আর উন্নতি হয় না।' কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর মধ্যে অনেকখানি সত্য লুকনো আছে।

কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে কি হয়, সেটাও তো নিত্য নিত্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গুণীজনের উচ্চাঙ্গ সৃষ্টি অধ্যয়ন না করেই, আরম্ভ হয়ে যায় 'এপিক' লেখা, তু'কদম চলতে না শিখেই ডান্স্ 'কম্পোজ' করা, আরো কত কী, এবং সর্বকর্মে নামঞ্জুর হলে সমালোচক হওয়ার পন্থা তো সব সময়েই খোলা আছে। সেই যে পুরনো গল্প—শহর-পাগলা ভাবতো, সে বিধবা মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। পাগলা সেরে গেছে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর পাগলাগারদের বড় ডাক্তার তাকে ডেকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে শুধালেন, 'তা তুমি খালাস হওয়ার পর করবে কি?' সুস্থ লোকের মতো বললে, 'মামার বড় ব্যবসা আছে, সেখানে ঢুকে যাবো।' 'সেটা যদি না হয়?' চিন্তা করে বললে, 'তা হলে আমার বি-এ ডিগ্রী তো রয়েছেই—টুইশনি নেব।' তারপর এক গাল হেসে বললে, 'অত ভাবছেন কেন, ডাক্তার? কিছু না হলে যে কোনো সময়ই তো আবার মহারানীর স্বামী হয়ে যেতে পারবো।' সমালোচক সব সময়ই হওয়া যায়।

তৃতীয় দল অন্য পন্থা নিলে। ওস্তাদদের হুবহু নকল তারা করলে না—

তাতে বয়নাক্কা বিস্তর। আবার বিন্-তালিমের 'অরিজিনালিটি পাঠকসাধারণ পছন্দ করে না। উপায় কি? তাই তারা ওস্তাদদের কতকগুলো বাছাই বাছাই জিনিস অনুকরণ করলে এবং শুধু অনুকরণই না, বাছাই বাছাই জিনিসগুলোর মাত্রা দিলে বাড়িয়ে।

চার্লি চ্যাপলিন একবার নাম ভাঁড়িয়ে গোপনবাসের জন্য গেছেন চিলির এক অজানা শহরে। বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন—'সোমবার রাত্রে শহরের কনসার্ট ঘরে চার্লি চেপলিনের নকল করার প্রতিযোগিতা হবে। ভ্যাগাবণ্ড চার্লির বেশভূষা পরিধান করে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজের ইস্পাস্ উস্পার হতে হবে চার্লি ধরনে। সর্বোৎকৃষ্ট অনুকরণের পুরস্কার পাঁচশ টাকা।'

চার্লি ভাবলেন, এখানে তো কেউ তাঁকে চেনে না, দেখাই যাক না, প্রতিযোগিতায় ছদ্মনামে নেমে কি হয়।

ছাব্বিশ জন প্রতিযোগীর ভিতর চার্লি হলেন বারো নম্বর।

তার সরল অর্থ, ঐ ছোট শহর, ধাড়ধাড়া গোবিন্দপুরে বারো জন ওস্তাদ রয়েছেন যাঁরা চার্লিকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন চার্লির পার্ট কি করে প্লে করতে হয়!

চার্লি শিরে করাঘাত করে বলেছিলেন, 'হে ভগবান, আমার অভিনয় যদি এই বারো জনের মতো হয় তবে আমি আত্মহত্যা করে মরবো।'

ব্যাপারটা হয়েছে, চার্লি যেখানে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা দিয়ে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন, এঁরা সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মস্করাতে পরিণত করেছেন। চার্লি যেখানে চোখের জলের রেশ মাত্র দেখিয়েছেন, এঁরা সেখানে হাউমাউ করে আসমান-জমীন ফাটিয়ে আড়াই ঘটি চোখের জল ফেলেছেন। চারুকলার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে চার্লি যেখানে অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশান্ত শিব সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তাঁরা প্রত্যেক অঙ্গে ফাইলেরিয়ার গোদ জুড়ে বানিয়ে তুলেছেন এক একটি বিকট মর্কট।

ঘরোয়া উপমা দিতে হলে বলি, ভেজাল সরষের তেলেরই বড় বেশী সোনালী ঝাঁঝ—মারাত্মক তুখোড়।

রবীন্দ্রনাথের 'দোদুল-দোলা', 'ব্যাকুল বেণু', 'উদাস হিয়াকে' 'দোলাতর', 'বেণুতর' করে নিত্য নিত্য কত না নবনব মস্করা হচ্ছে। কিন্তু তবু চার্লি বেঁচে গেছেন। কারণ আর যা-ই হোক মার্কিন মুল্লুক পরশু দিনের গড়া নবীন দেশ।

ভেজালে এদের অভিজ্ঞতা আর কতটুকু? প্রাচীন চীনের কাহিনী শ্রবণ করুন।

একদা চীন দেশে এক গুণীজ্ঞানী, চরিত্রবলে অতুলনীয় বৌদ্ধ শ্রমণের আবির্ভাব হয়। যেমন তাঁর মধুর সরল শিশুর মতো চলাফেরা-জীবনধারা, তেমনি তাঁর অদ্ভুত বচনবিন্যাস। বুদ্ধের কীর্তিকাহিনী তিনি কখনো বলতেন বলদৃপ্ত কণ্ঠে, কখনো সজল করুণ নয়নে—তথাগতেরই মতন তখন তাঁর সৌম্যবদন দেখে, আর উৎসাহের বচন শুনে বহু শত নরনারী একই দিনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতো। ক্রমে ক্রমে তাঁর মাতৃভূমির সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি বেজে উঠলো, বুদ্ধের জীবনাদর্শ বহু পাপীতাপীকে ধর্মের মার্গ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করলো।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার পর তাঁর মৃত্যুক্ষণ কাছে এল। তাঁর মন কিন্তু শান্ত, তাঁর চিত্ত নিষ্কম্প প্রদীপশিখাবৎ। শুধু একটি চিন্তা-বাত্যা ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মুমূর্ষু প্রদীপশিখাকে বিতাড়িত করছে। শিষ্যেরা বুঝতে পেরে সবিনয় জিজ্ঞেস করলে, সেবাতে কোনো ত্রুটি হচ্ছে কি না।

গুরু বললেন, 'না। ইহলোক ত্যাগ করতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার মাত্র একটি ভাবনা। আমার মৃত্যুর পর আমার কাজের ভার কে নেবে?'

শিষ্যেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর চরিত্রবল কে পেয়েছে, তাঁর বক্তৃতাশক্তি কার আছে যে এ-কঠিন কাজ কাঁধে তুলে নেবে?

গুরু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এমন সময় অতি অজানা এক নূতন শিষ্য সামনে এসে বললে, 'আমি এ ভার নিতে পারি।'

গুরুর বদনে প্রসন্নতার দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠলো। তবু ঈষৎ দ্বিধায় কণ্ঠে শুধালেন, 'কিন্তু বৎস তোমাকে তো আমি চেনবার অবকাশ পাইনি। তুমি কি সত্যিই এ কাজ পারবে? ঐ দেখো, আমার দীর্ঘ দিনের শিষ্যেরা সাহস না পেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা দেখি, তুমি অমিতাভের জীবনের যে কোনো বিষয় নিয়ে একটি বক্তৃতা দাও তো।'

বিস্ময়! বিস্ময়!—সেই শিষ্য তখন গলা খুলে গাধার মতো, হুবহু গাধার মতো চেঁচিয়ে উঠলো। কিছু না, শুধু গাধার মতো চেঁচালে।

সবাই বাক্যহীন নিস্পন্দ।

ব্যাপার কি?

গুরুর মাত্র একটু সামান্য ত্রুটি ছিল। তিনি বক্তৃতা দেবার সময় অন্য

বক্তাদের তুলনায় একটু বেশী চিৎকার করে কথা বলতেন। ভুঁইফোঁড় শিষ্য ভেবেছে ভালো করে চেঁচাতে পারাতেই উত্তম বক্তৃতার গূঢ় রহস্য। ঐ কর্মটি সে করতে পারলে তাবৎ মুশকিল হবে আসান। তাই সে চ্যাচানোর চ্যাম্পিয়ন রাসভরাজের মতো চেঁচিয়ে উঠেছে।

আমার গুরুদেবের পিতৃতুল্য অগ্রজ সত্যদ্রষ্টা, প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন।

'To imitate-এর বাঙলা, অনুকরণ।

To ape-এর বাঙলা, হনুকরণ।'

এ স্থলে রাসভকরণ॥

ফরাসী-বাঙলা

রবীন্দ্রনাথ নাকি কোনো একস্থলে খেদ করেছেন, আমরা ইয়োরোপের যে-টুকু চিনলুম সেটা ইংরেজের মারফতে।

তিনি ঠিক কি বলেছিলেন মনে নেই বলে অপরাধ মেনে নিয়ে নিবেদন করি, ইংরেজ বরঞ্চ চেষ্টা করেছে আমরা যেন ইয়োরোপকে না চিনতে পারি।

ইংরেজ যখন এদেশে রাজত্ব করতো তখন দু'টি প্রচারকর্মে মেতে থাকতে সে বড় আনন্দ পেত। তার প্রথম, বিশ্বজনকে জানানো যে, ভারতীয়েরা ড্যাম, নিগার, কালা আদমী, তাদের কোনো প্রকারের কল্‌চর নেই! দ্বিতীয়, ভারতীয়দের জানানো, ইংরেজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত এবং তাই (আ ফর্তিয়রি) ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নেশন তো বটেই। প্রমাণস্বরূপ শেক্‌সপিয়রের নাম করলে।

আমরা তখন আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই-পরখ করে দেখলুম, কথাটা ঠিক; শেক্‌স্‌পিয়রের মতো কবি পৃথিবীতে কম—নেই বললেও চলে। ইংরিজিতেই পড়লুম, ফরাসী-জর্মন-ওলন্দাজ-দিনেমার সবাই এ-কথা স্বীকার করেছে। তাই আমর ইংরেজদের বাদ-বাকি দাবীগুলোও সুড়সুড় করে মেনে নিলুম। ঘড়েল মিথ্যে সাক্ষী—কনফিডেন্‌স্‌ ট্রিক্‌স্‌টার—এই ভাবেই সরল জনকে আপন সব পচা মাল পাচার করে দেয়।

ইংরেজ কিন্তু এ-কথা বলতে ভুলে গেল, উপন্যাসে তার টলস্টয় নেই, গল্পে তার মপাসাঁ নেই, চিত্রকলায় তার রাফায়েল নেই, ভাস্কর্যে তার মাইকেল এঞ্জেলো নেই, দর্শনে কাণ্ট নেই, নৃত্যে পাভলোভা নেই, ধর্মে লুথার নেই, সঙ্গীতে বেটোফেন নেই।

বিশেষ করে বেটোফেনের কথাই তুললুম।

ইংরেজ জাত সুর-কানা। তাই সে বেটোফেনের নাম করে না। তাই ইংরেজের বাড়িতে সঙ্গীতচর্চা নেই। যদি থাকতো তবে এ-দেশের বড় সায়েবদের বাড়িতেও সে-চর্চা আসন পেত। আমরাও ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত

হতুম। ইংরেজ চর্চা করলে, এবং আমাদের শেখালে জ্যাজ্—যেটা তার খুড়তুতো ভাই মার্কিন শিখলে তাদের গোলাম নিগ্রোদের কাছ থেকে।

অতি অবশ্য আমাদেরও দোষ আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা হাজারে হাজারে ফ্রান্স্-জর্মনী-ইতালি-রুশে যায়নি বটে, কিন্তু শতে শতে তো গিয়েছে। তাদের মধ্যে যে ক'জন ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তাদের সংখ্যা এক হাতের এক আঙুলে গোনা যায় (এবং আশ্চর্য, যে মহাজন আমাদের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন তিনি কখনো ফ্রান্সে যাননি—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

'দেশ' পত্রিকার এ সংখ্যা ফরাসিস্ সাহিত্য নিয়ে। অতএব সেই বিষয়বস্তুর ভিতরেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করি।

ইংরিজি ভাষা গম্ভীর এবং জটিল কিন্তু তার প্রসাদগুণও আছে। ফরাসী চটুল ও রঙীন। অতিশয় গম্ভীর বিষয় আলোচনা করার সময়ও ফরাসী কেমন যেন একটুখানি তরল থেকে যায়। পক্ষান্তরে রসিকতা করার সময়ও ইংরিজি তার দার্ঢ্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারে না। চার্লস্ ল্যাম্ এমন কি জেরম্ কে জেরম্ পর্যন্ত যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটা ধ্রুপদ। উড্‌হাউসে এসে আমরা সর্বপ্রথম চটুলতা পাই।

কিন্তু এহ বাহ্য। ফরাসী ভাষার সর্বপ্রধান গুণ তার স্বচ্ছতা, তার সরলতা। ফরাসীরা নিজেই বলেন, 'যে বস্তু স্বচ্ছ (ক্ল্যার, ক্লিয়ার) নয়, সে জিনিস ফরাসী নয়।' আমাদের দেশে আজকাল যে দুর্বোধ্য অবোধ্য পদ্য বেরয় সে 'মাল' প্রথম যখন ফ্রান্সে বেরতে আরম্ভ করল তখন গুণী আনাতোল ফ্রাঁস বলেছিলেন, 'যে মধুর ললিত বয়সে মানুষ অবোধ্য জিনিস ভালোবাসে আমার সে বয়স পেরিয়ে গিয়েছে; আমি আলো ভালবাসি।' তাই আরেক গুণী শেষ কথা বলেছেন, 'স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা, পুনরপি স্বচ্ছতা।'

ফরাসী চটুলতা হয়ত অনেকেই অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু ফরাসী স্বচ্ছতা বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যে যদি আসতো তবে আর কিছু না হোক, আমাদের মনন সাহিত্য যে অনেকখানি লোকপ্রিয় হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদি আরো একটুখানি ফরাসী আওতায় আসতেন তবেই ঠিক বোঝা যেত তাঁর দেবার মতো সত্যিই কিছু ছিল কিনা। এ বিষয়ে বরঞ্চ বলবো, শ্রীযুত অন্নদাশঙ্করের লেখা অনেকখানি ফরাসিস্।

শব্দতত্ত্ব এবং ভাষাতাত্ত্বিকেরা ঠিক ঠিক বলতে পারবেন কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার নিবেদন, বাঙলা ভাষার উপর ফরাসী ভাষার (language) প্রায় কোনো প্রভাবই পড়েনি। বাঙলাতে ক'টি ফরাসী শব্দ ঢুকেছে সে কথা পাঁচ আঙুলে গুনেই বলা যায়। অবশ্য এইটেই শেষ যুক্তি নয়; আমরা বাঙলাতে প্রচুর আরবী এবং ফার্সী শব্দ নিয়েছি বটে কিন্তু ঐ দুই ভাষার প্রভাব আমাদের উপরে প্রায় নেই। কিন্তু অন্য কোনো বাবদেও ফরাসী ভাষার প্রভাব বাঙলার উপর আমি বড় একটা পাইনি।

সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ়বিশ্বাস ইনি ফরাসী সাহিত্যের যতখানি চর্চা করেছেন ততখানি চর্চা বাঙলাদেশে তো কেউ করেনই নি, অল্প ইংরেজ জর্মন ইতালিয়ই—অর্থাৎ অ-ফরাসিস্—করেছে। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, কত বিচিত্র বস্তুই তিনি ফরাসী থেকে অনুবাদ করে বাঙলায় প্রচার করেছেন। এই যে ইংরিজি এবং ফরাসী পাশাপাশি জাতের ভাষা—সেই ইংরিজিতেই পিয়ের লোতির লেখা 'ভারত ভ্রমণ' অনুবাদ করতে গিয়ে ইংরেজ অনুবাদক হিমসিম খেয়ে গিয়েছেন, অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদে মূল ফরাসী যে ঠিক ঠিক ধরা পড়েছে তাই নয়, প্রাচ্য দেশীয় আবহাওয়াও সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে।

এই জ্যোতিরিন্দ্রের বাঙলা ভাষাতেও ফরাসী ভাষার কোনো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না।

*　　*　　*　　*

বরঞ্চ ফরাসী শৈলীর (style) প্রভাব বেশ কিছুটা আছে।

বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা পাকাপাকিভাবে বলতে পারবেন, বাঙলার কোন্ লেখক সর্বপ্রথম ফরাসীর সঙ্গে বাঙলার যোগসূত্র স্থাপনা করেছিলেন; আমি শুধু সার্থক সাহিত্যিকদের কয়েকজনের কথাই তুলবো।

মাইকেলের সার্থক সৃষ্টিমাত্রই গম্ভীর—সংস্কৃত এবং লাতিনের ক্লাসিকাল গুণের সঙ্গে তিনি তাঁর বীণার তার বেঁধে নিয়েছিলেন। ওদিকে তিনি আবার অতি উত্তম ফরাসী জানতেন—নূতন ভাষা তিনি যে কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারতেন, সে কথা আজকের দিনের ভাষার 'ব্যবসায়ী'রা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু সে 'রঙীলা ঘরানা' তাঁর ভাষার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।[১] তাই কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে তিনি লা ফঁতেনের ধরনে

(১) বরঞ্চ গৌর বসাককে লেখা চিঠিগুলোতে প্রচুর ফরাসী ক্রিভলিটি পাবেন।

'ফাব্‌ল্‌' (ফেব্‌ল্‌) রচনা করলেন কেন ? লা ফঁতেন তাঁর অনেক গল্প নিয়েছেন ঈশপের গম্ভীর গ্রীক থেকে, কিন্তু লিখেছেন অতি চটুল ফরাসী কায়দায়। অথচ তাঁরই অনুকরণে যখন মাইকেল বাঙলাতে 'ফাব্‌ল্‌' রচনা করছেন তখন তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলছেন,

'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে—'

দুই সুর একেবারে ভিন্ন। অথচ মাইকেলের প্রায় সব ক'টি 'ফাবলের' উৎস লা ফঁতেন।

প্রহসনেও তাই। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র মূলে মলিয়ের। অথচ শৈলীতে গম্ভীর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। যদিও তাঁর আপন ভাষাতে ফরাসী প্রভাব নেই তবু তিনি অনুবাদের মারফতে যে শৈলী এবং বিষয়বস্তুর অবতারণা করে গেলেন তার প্রভাব বাঙলা সাহিত্যের দূর দূরান্তে পৌঁছে গিয়েছে এবং আরো বহুদিন ধরে পৌঁছবে।

তেয়োফিল গতিয়ে, এমন কি বাল্‌জাক্‌ও, মপাসাঁর পূর্বে কয়েকটি সার্থক ছোট গল্প লিখেছেন। কিন্তু আজ, শুধু ফরাসিস না, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্বীকার করে, মপাসাঁই ছোট-গল্পের আবিষ্কর্তা। তিনিই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, দীর্ঘ উপন্যাস না লিখেও পাঠককে কি প্রকারে কাহিনী-রসে আপ্লুত করা যায় ('কণ্ঠহার' গল্প নিয়ে সাত ভলুমী 'জাঁ ক্রিস্তফ' লেখা যায়)। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য দস্‌তেয়ফস্কির মতো ভলুম ভলুম না লিখেও 'সূত্ররূপে' সেই রস পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা যায়।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ছোট-গল্প লেখক রবীন্দ্রনাথ যবে থেকে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের মারফতে মপাসাঁকে চিনতে শিখলেন তবে থেকেই তাঁর গল্প ঋজু কাঠামো নিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ পেল (অবশ্য প্রথম থেকেই তাঁর গল্পে থাকতো প্রচুর গীতিরস এবং পরবর্তী যুগে তিনি অন্য এক মিস্‌টিক নবরসে ছোট-গল্পকে অপূর্ব এক নবরূপ দান করেন)।

*　　　　*　　　　*

দান্তে, শেক্‌স্‌পিয়র, গ্যোটে, কালিদাস, কেউই পৃথিবীর সুদূরতম সাহিত্যকে এতখানি প্রভাবান্বিত করতে পারেননি মপাসাঁ যতখানি করেছেন। এটম্‌ বম্‌ হয়ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার, কিন্তু বাইসিক্‌ল্‌ ও সেলাইয়ের কল যে রকম

গ্রামে গ্রামে পৌঁচেছে, এটম্ বম্ শেক্স্‌পিয়র সে রকম সাহিত্যে সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিতে পারেননি।'[১]

অথচ আজো যখন কোনো মানুষের জীবনে কোনো এক অদ্ভুত বিচিত্র অভিজ্ঞতা আসে সে তখন তার প্রকাশ দেবার চেষ্টা করে ছোট-গল্পের মাধ্যমে, অর্থাৎ মপাসাঁর কাঠামো নিয়ে। ইংরেজ, জর্মন, রুশ, বাঙলা এ-সব অর্বাচীন সাহিত্যের কথা বাদ দিন, অতিশয় প্রাচীন চীন আরবীর মতো ক্লাসিকাল্ সাহিত্যেও আজকের দিনে মপাসাঁ ছোট গল্পে আদি গল্পগুরু বাল্মীকি। সবাই তাঁরই 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।'

*　　　*　　　*

বাঙলা সাহিত্যে মপাসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তিনি ফরাসী জানতেন কি না শৈলী-আলোচনায় সে প্রসঙ্গ অবান্তর: তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তস্য শিষ্য রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং এঁদের মাধ্যমে মপাসাঁর শরণ নিয়েছিলেন। বাঙলাদেশের কোনো গল্পলেখকই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো মপাসাঁর এত কাছে আসতে পারেননি। মপাসাঁর মতো প্রভাতের ছিল সমাজের নানা শ্রেণী, নানা চরিত্র, নানা পরিস্থিতি নিয়ে নবীন নবীন গল্প গড়ে তোলার অসীম ক্ষমতা। মপাসাঁর মতো তিনিও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেখানেও দু'জনের আশ্চর্য মিল। ঔপন্যাসিকরূপে মপাসাঁ ফ্রান্সে বিশেষ কোনো সম্মান পাননি; বাঙলাদেশে প্রভাত মুখোপাধ্যায়েরও সেই অবস্থা।

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নিবেদন, প্রভাত-পরবর্তী যুগের প্রায় সব বাঙালী গল্পলেখকই মপাসাঁর অনুকরণ করেছেন প্রভাতের মাধ্যমে।

*　　　*　　　*

এই সময়ে 'ভারতী'কে কেন্দ্র করে শক্তিশালী এক নূতন কথাসাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এ গোষ্ঠী অহরহ অনুপ্রেরণা পেত জ্যোতিরিন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। এঁদের ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্র দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী ও সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এঁরা প্রধানত ফরাসী সাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করে বাঙলাদেশে এক নূতন ফরাসিস 'গুলস্তান' বানাতে আরম্ভ করলেন। এঁদের একটা মস্ত সুবিধে ছিল এই যে, এঁরা রবীন্দ্রনাথের গড়া আধুনিকতম বাঙলার সম্পূর্ণ ব্যবহার করবার সুযোগ

(১) হেমচন্দ্র বিস্তর শেক্স্‌পিয়র অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু বাঙলাতে আজ পযন্ত কেউ শেক্স্‌পিয়রের অনুকরণ করেননি।

পেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে সুযোগ পাননি বলে তাঁর ভাষা ছিল বিদ্যাসাগরী। এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাবলীল ভাষা ব্যবহার করাতে তখনকার দিনের বাঙালী পাঠকের মর্মদ্বারে দরদী আঘাত হানতে পেরেছিলেন।

সবচেয়ে 'তাজ্জব ভেল্কিবাজি' দেখালেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত! তাও আবার কাব্যে! এক ভাষার কবিতা যে অন্য ভাষাতে তার আপন রূপরসগন্ধস্পর্শ নিয়ে এরকমভাবে প্রকাশ পেতে পারে তার কল্পনাও বাঙালী পাঠক এর পূর্বে কখনো করতে পারেনি। সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হেম বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এমন কি রবীন্দ্রনাথও বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু এক 'সদ্ভাব-শতক' ছাড়া অন্য কোনো বই জনপ্রিয় হতে পারেনি। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি বলেছেন, অনুবাদমাত্রই কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকের মতো ; মূল নকশার সন্ধান তাতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর-সব সৌন্দর্য উল্টো পিঠে ওতরায় না। সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন, ওতরায়, এবং মাঝে মাঝে উল্টো দিকটাও মূলের চেয়ে বেশি মূল্য ধরতে জানে।

যাঁরা সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন। অন্যতম বিখ্যাত অনুবাদক কান্তি ঘোষ বহুবার একথা বলেছেন। তিনি নেই। তাই আজকের দিনের সবে-ধন নীলমণি নরেন্দ্র দেবকে আমি সাক্ষী মানছি।

তেয়োফিল গতিয়ে, রঁসার, ল্যকঁৎ দ্য লিল্, ভেরলেন্, বদলের, য়্যুগো (Hugo), শেনিয়ে, মিস্ত্রাল, ভেরেরেন্, ভালমোর, বেরাজেঁ—কত বলবো ?—কত না, জানা-অজানা কবির কত না কবিতার 'তীর্থ-সলিল' দিয়ে তিনি তাঁর কুম্ভ পূর্ণ করলেন, কত দেশের কত 'তীর্থরেণু' বাঙালীর কপালে ছুঁইয়ে দিলেন।

ঋগ্বেদে আছে, হে অগ্নি, তুমি আমাদের পুরোহিত, কারণ তুমি আমাদের সর্ব আহুতি দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও। সত্যেন্দ্রনাথ বহু দেশের বহু কবির পুরোহিত।

কথাসাহিত্যেও ঐ সময়ে প্রচুর ফসল ফললো। গতিয়ে, য়্যুগো, মেরিমে, দোদে, মপাসাঁ, দ্যুমা, বাল্জাক্ ইত্যাদি বহু লেখকের বহু ছোট-গল্প এবং উপন্যাসও বাঙলায় অনূদিত হল। এ গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বাঙলা সাহিত্যে কতখানি স্থায়ী মূল্য ধরে তার বিচার একদিন হবে ; উপস্থিত বলতে পারি এঁরা বাঙলা সাহিত্যে যে ফরাসী উদারতার আমন্ত্রণ জানালেন তার ফলে পরবর্তী যুগের অনেক বাঙালী লেখক গোড়ার থেকেই সঙ্কীর্ণতামুক্ত হয়ে সাহিত্যের আরাধনা করতে পেরেছিলেন।

হঠাৎ একদিন বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে এঁদের লোকপ্রিয়তা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পায়। কিন্তু শরতের মোহ কেটে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেন যে কেউ এঁদের হেমন্তের সফলতা সন্ধান করে না সে এক আশ্চর্যের বস্তু!

*　　　*　　　*

বাঙলায় ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে শুধু প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়। ইনিই একমাত্র বাঙালী সাহিত্যিক যাঁকে সর্বার্থে ফরাসিস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একমাত্র এঁরই ভাষাটিতে 'ঈভনিং ইন্ প্যারিসের' খুশবাই পাওয়া যায়। এঁর শৈলী ফরাসী শ্যাম্পেনের মতো বুদ্বুদিত, ফেনায়িত। এমন কি এঁর বিষয়বস্তুও মাঝে মাঝে ফরেসডাঙার ধুতি পরে মজলিসে এসে বসে। বাঙলা সাহিত্যে বহু পণ্ডিত, বহু দার্শনিক, বহু কলাবিদ এসেছেন, কিন্তু একমাত্র এঁকেই সত্য বিদগ্ধ জন বলা যেতে পারে। এবং সে বৈদগ্ধ্য ফরাসী বৈদগ্ধ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসিসের সঙ্গে বাঙালীর চারি চক্ষের মিলন ঘটিয়েছিলেন; প্রমথনাথে দুই সাহিত্যে গভীরতম প্রণয়ালিঙ্গন।

এঁর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ত বাঙলাদেশ একদিন ভুলে যাবে, কিন্তু এই বাঙালী ফরাসিস্ চরিত্রকে বাঙালী কখনো ভুলবে না।

প্রমথনাথের শেষ বয়সে ভারতী গোষ্ঠীর মুমূর্ষু অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি এদেশে আসেন। তাঁর চতুর্দিকে তখন এক ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। এঁদের প্রধান ফণী বোস[১], প্রবোধ বাগচি, মণি গুপ্ত, শশধর সিংহ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন। এঁদের কেউই প্রচলিতার্থে সাহিত্যে নামেননি কিন্তু এঁদের মাধ্যমে আমরা এদেশে সর্বপ্রথম ফরাসী পাণ্ডিত্যের সন্ধান পাই। এতদিন আমরা জানতুম, ইয়োরোপীয় 'প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব' বলতে বোঝায় ইংরেজ। এঁরাই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, ফরাসিস্ ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে রাজত্ব না করেও ভারতীয় শাস্ত্রের চর্চা করেছে প্রচুর[২]। বিশেষ করে আমাদের চিত্রকলা সঙ্গীতাদির। প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছি

---

(১) ইনি যৌবনেই দেহত্যাগ করেন, কিন্তু এঁর রচনা তখনই বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

(২) পরবর্তী যুগে ভিন্‌টারনিৎস্ জর্মন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এবং তুচ্চি ইতালীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান। এঁদের সবাই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে, বিশ্বভারতীতে।

সাহিত্য ছাড়া অন্য রসে ইংরেজ বঞ্চিত। ফরাসীরা সেখানে যথার্থ গুণী। ...শি গুপ্তের অনুবাদে বাঙালী তার সন্ধান পাবে। শান্তা দেবী এই সময়েই বিশ্বভারতীতে ফরাসী শেখেন।

এই গোষ্ঠীর বাইরে আরো দু'জন পণ্ডিতের নাম করতে হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লা এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দিলীপ রায় আর কালিদাস নাগও এই যুগের লোক।

* * *

কিন্তু আমাদের জোড়া কুৎব্-মিনার? বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ? তা হলে দীর্ঘতর প্রবন্ধ লিখতে হয়। সংক্ষেপে নিবেদন করি।

বঙ্কিম কিঞ্চিৎ ফরাসিস্ জানতেন। কিন্তু তিনি ইংরিজির মাধ্যমে কঁৎ-কে চিবিয়ে খেয়েছিলেন। পূর্বশূরগুণের প্রসাদাৎ কঁৎ ফরাসী তর্কালোচনায় যে শুদ্ধবুদ্ধির (rationality-র) চরমে পৌছেন, বঙ্কিম সেই শাণিত অস্ত্র নিয়ে হিন্দুধর্ম রণাঙ্গনে প্রবেশ করেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার সবিস্তর আলোচনা অসম্ভব। তাই এই আক্ষেপ দিয়েই বঙ্কিমালোচনা শেষ করি, হায়, তাঁর এই শুদ্ধবুদ্ধির অনুসরণ আর কেউ করলে না কেন? যে লোক ইস্তেক দয়াসাগরের খেলাফে তলোয়ার খাড়া করেছিল তার অনুকরণ, অনুসরণ এমন কি 'হনুকরণ'ও কেউ করলো না কেন?

রবীন্দ্রনাথের উপর মপাসাঁর ছায়া পড়েছিল সে-কথা পূর্বেই বলেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে তিনি ফরাসী কবিতানাট্য এমন কি 'শারাদ'ও পড়েছিলেন। তারই ফলে

> Celui qui me lira, dans les
> siecle, un soir,
> Troublant mes vers—

ইত্যাদি (ইংরিজিতে শব্দে শব্দে অনুবাদ: One who will read me, after centuries, one evening, turning over my verses—) 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' হয়ে বেরল। কিন্তু প্রথম কয়েকছত্রের পরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলে গিয়েছেন।

ঠিক সেইরকম মেটারলিঙ্কের 'নীলপাখি' যে কাঠামোতে[১] লেখা, রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'অরূপ রতন' সেই কাঠামো নিয়ে, কিন্তু উভয় নাটকের বিষয়বস্তু

(১) 'লোয়াজো ব্ল্যু' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙলায় অনুবাদ করেন।

নির্বাচনে এবং রসনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্ককে অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছেন। এবং সর্বশেষ নাটকদ্বয় 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'-র কাঠামোও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব—ভাষা, শৈলী, রসনির্মাণ পদ্ধতি রাবীন্দ্রিক তো বটেই।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, অরবিন্দ ঘোষ (ইনি উত্তম ফরাসী জানতেন)—এঁদের মতো প্রতিভাবাবান লেখকের রচনাতে এঁর প্রভাব, ওঁর ছায়াপাতের অনুসন্ধান করে কোনো লাভ নেই। হীনপ্রাণ লেখক সর্বক্ষণ ভয়ে মরে, ঐ বুঝি লোকে ধরে ফেললে, সে অমুকের কাছ থেকে ধার নিয়েছে; তাই সে মহাজনদের বাড়ির ছায়া মাড়ায় না। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ নিজেরাই এত বড় মহাজন যে, তাঁরা যত্রতত্র অনায়াসে বিচরণ করেন। ক্ষুদ্রতম লেখকের বাড়িতেও পাত ফেলতে তাঁদের কণামাত্র ভয় নেই। তাঁদের ঘানিতে যাই ফেল না কেন, স্নেহঘন হয়ে বেরিয়ে আসবে।

এইবারে শেষ প্রশ্ন: ফরাসীর উপর বাঙলা কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে কি?

রলাঁ যেরকম বহু বাঙালী লেখককে প্রভাবান্বিত করেছেন, ঠিক তেমনি তিনিও বাঙালী গুণী-জ্ঞানীদের সন্ধান রাখতেন। ব্রাহ্ম আন্দোলন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং এঁদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। বহু ফরাসী এঁরই মারফতে বাঙলাদেশের অনেক কিছু চিনতে শিখেছে।

পূর্বেই বলেছি, লেভির সঙ্গ পেয়ে বাঙালী গুণী ফরাসী পাণ্ডিত্যের চর্চা করেছিল। লেভি নিজে করলেন উল্টোটা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পেয়ে তাঁরই সাহায্যে করলেন 'বলাকা'র ফরাসী অনুবাদ! আজ যদি শুনি, পাণিনি কোনো এক চীনা কবির রচনা সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন তা হলে যে-রকম আশ্চর্য হই।

শ্রীমতী আঁদ্রে কারপেলেজ ফরাসীতে একখানা সঞ্চয়িতা বের করেন। তার নাম ফ্যই দ্য ল্যাঁদ—'লীভজ্ অব্ ইণ্ডিয়া'। এই চয়নিকায় বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য নিয়েই আলোচনা ছিল প্রধানত। দুর্ভাগ্যক্রমে বইখানা আমার হাতের কাছে নেই। নেই অরু দত্ত।

এবং নেই শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক ফের্না বেনওয়ার রচনাবলী। অমিয় চক্রবর্তীর সহযোগিতায় তিনি 'মুক্তধারা'র ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন 'লা মাশিন' (দি মেশিন) নাম দিয়ে এবং পরবর্তী যুগে বাঙলা সম্বন্ধে আরো বিস্তর লেখা ফরাসীতে প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন।

এবং মারাত্মক নেই, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ফরাসী প্রেসের অভিমত, অভ্যর্থনা, অকুণ্ঠ প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথ যতবার ফ্রান্সে গিয়েছেন যখনই তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছে ফ্রান্স তখনই বাঙলাদেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাকে স্বীকার করেছে। প্যারিসে স্বীকৃতি পাওয়া সহজ কর্ম নয়। এ-সব প্রেস্ কাটিংস্ অনুসন্ধিৎসু পাঠক শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে পাবেন। সে এক বিরাট ব্যাপার!

অর্থাৎ হাতের কাছে কিছুই নেই—'ঢাল নেই তলোয়ার নেই'—

তাই আর কেউ বলার পূর্বেই স্বীকার করে নিই, এ লেখা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ॥

চার্লি চ্যাপলিন

আমার ছেলেবেলায় বায়স্কোপও ছেলেমানুষ ছিল। হরেক রকম ফিলিম তখন আসতো; ছোট, বড়, মাঝারি—এখনকার মতো স্টাণ্ডার্ডাইজ্‌ড নয়। সেনসর বোর্ড-ফোর্ডও তখন শিশু, এখনকার মতো 'জ্যাঠা' হয়ে ওঠেনি—'এটা অশ্লীল', 'ওটা কদর্য', 'সেটা বড় কর্তাদের নিয়ে মস্করা করেছে' বলে দেশের দশের রুচি মেরামত করার মতো হরিশ মুখুজ্যে দি সেকেণ্ড হয়ে ওঠেনি। কাজেই হরেক রুচির ফিলিম তখন এদেশে অক্লেশে আসতো এবং আমরা সেগুলো গোগ্রাসে গিলতুম। তার ফলে আমাদের চরিত্রের সর্বনাশ হয়েছে, এ কথা কেউ বলেনি। এবং আজ যে সেনসর বোর্ডের এত কড়াক্কড়ি, তার ফলে এযুগের চ্যাংড়া-চিংড়িরা যীশুখেষ্ট কিংবা রামকেষ্ট হয়ে গিয়েছে, এ মস্করাও কেউ করেনি। তবু শুনেছি সেনসর বোর্ডের বিশ্বাস, বিস্তর ছবি ব্যান্ করলে শেষটায় ভালো ছবি বেরবে। তাই যদি হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটা সেনসর বোর্ড লাগাও না কেন? কাকা-মামা-শালাদের চাকরি তো হবেই এবং সুবো-শাম হুদোহুদো বই ব্যান্ করার ফলে একদিন ইয়া দাড়ি গোঁপ সমেত আরেকটি সমুচা রবিঠাকুর বেহেশং থেকে টুকুস্ করে টস্কে পড়বেন—এই যেরকম হাওড়া ইস্টিশানের কল থেকে প্ল্যাটফর্ম টিকিট মিন্‌ফসে'প্‌সে বেরিয়ে আসে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এরা কার রুচি রিফর্ম করতে চায়? আমার? সাবধান! পাড়ার ছোঁড়ারা আমায় মানে (ওরাই আমাকে মাঝে মধ্যে বায়স্কোপে নিয়ে যায়), শুনলে ক্ষেপে উঠবে। বোর্ডেরও প্রাণের ভয় আছে। তবে কি টাঙাওলা বিড়িওলাদের? ওঃ! কী দম্ভ! ওদের রুচিতে ভণ্ডামী নেই। ঐটে পেলে আমি বর্তে যেতুম।

কিন্তু সে কথা থাক্। এই সেনসরিং ব্যাপারটা দেশে-বিদেশে কি প্রকারে সমাধান হয় সে সম্বন্ধে আরেকদিন সবিস্তর আলোচনা করবো। ইতিমধ্যে ছোটা হিটলারদের স্মরণ করিয়ে রাখি বড়া হিটলাররা জর্মানিতে 'অল কোয়ায়েট' ফিলিম ব্যান্ করেছিল!

সেই যুগে হঠাৎ দেখা দিলেন মহাকবি চার্লি চ্যাপলিন—ভগবান তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন।

সাহিত্য বলুন, সঙ্গীত বলুন, চিত্রকলা বলুন, ভাস্কর্য বলুন, এ রকম একটি তাজমহলের-সামনে-দাঁড়িয়ে-নটরাজ পৃথিবীতে আর কখনো উদয় হয়নি। এঁর প্রতিভা অতুলনীয়। বাগ্দেবী এঁর কণ্ঠে, উর্বশী পদযুগে, এঁর দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুর চক্র (গ্রেট ডিক্‌টেটর), বাম হস্তে দাক্ষিণ্যের বরাভয় (সিটি লাইট)। ইনি বিশ্বকর্মা (মডার্ন টাইমস), ইনি নীলকণ্ঠ (মসিয়ো ভেরদু)। 'অতি বড় বৃদ্ধ' বলেই ইনি 'সিদ্ধিতে নিপুণ' এবং লগ্ন এলে শঙ্করের মতো নবীন বেশে সজ্জিত হতে জানেন (লাইম লাইট)।

রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে শরৎচন্দ্র একদা বলেছিলেন, 'তোমার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।' সেই রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুপারের হিস্পানী বিদেশিনীকে দেখে মুগ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন,

'সুনীল সাগরে শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

চার্লির দিকে তাকিয়ে সর্বক্ষণ এই দোহাটি মনে পড়ে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পর তলস্তয় একখানি প্রামাণিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ লেখেন। পুস্তকের প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন, 'হোয়াট ইজ্ আর্ট?' অর্থাৎ 'রস কি?' মধুর সঙ্গীত শুনে, উত্তম কাব্য পাঠ করে, দেবীর মূর্তি দেখে আমরা যে আনন্দরসে নিমগ্ন হই, সে বস্তুটি কি?

তার সংজ্ঞা দেওয়ার পর তলস্তয় বলেন, 'গুটিকয়েক উন্নাসিককে যে রস আনন্দ দান করে সে-রস হীন রস। আচণ্ডাল, (আ-সেনসর বোর্ড?)* জনসাধারণকে যে কাব্য আনন্দ দেয় সেই কাব্যই প্রকৃত কাব্য, উত্তম কাব্য। যথা, মহাভারত। পণ্ডিত মূর্খ, বৃদ্ধ বালক, পাপী পুণ্যবান, সকলেই এ কাব্য শুনে আনন্দ পায়।'

অবশ্য সর্ব পাঠক যে একই বস্তুতে আনন্দ পাবে এমনটা নাও হতে পারে। বালক হয়ত কাব্যের কাহিনী বা প্লট শুনে মুগ্ধ, বলদৃপ্ত যুবা হয়ত কর্ণার্জুনের

*পাঠক ভাববেন না, আমি কলকাতা বা দিল্লির বোর্ডের কথা ভাবছি। আমি সর্ববিশ্বের জীবিত ও মৃত সর্ব বোর্ডের কথা ভাবছি। শ' যে রকম 'কুইন্জ্ রীডার অব্ প্লেজ'-এর স্মরণে আপন মন্তব্য বিশ্ব-বোর্ডের উদ্দেশে লিখেছিলেন।

যুদ্ধবর্ণনা শুনে বীররসে লুপ্ত, বৃদ্ধ হয়ত শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনের আত্মসমর্পণ দেখে ভক্তিরসে আপ্লুত, এবং উদারচরিত সর্বরসে রসিকজন হয়ত প্রতি ঝঙ্কারে প্রতি মীড়ে প্রকৃত কাব্যরসে নিমগ্ন।

তা হলে প্রশ্ন মানুষের বর্বর রুচিকে কি মার্জিত করা যায় না? হয়ত যায়, কিংবা হয়ত যায় না, কিন্তু চেষ্টা আলবৎ করা যায়। সে চেষ্টা ভরত, দণ্ডিন্, মম্মট, আরিস্ততেল, রবীন্দ্রনাথ, ক্রোচে করেছেন, কিন্তু এঁদের গলা কেটে ফেললেও এঁরা কোনো বোর্ডের মেম্বর হতে রাজী হতেন না। মানুষের রুচিপরিবর্তন এঁরাই করিয়েছেন—কোনো বোর্ড কখনোই কিছু পারেনি।

বর্তমান যুগে চার্লি সেই রসই সর্বজনকে উপহার দিয়েছেন। এ যুগের সাহিত্যে, কাব্যে, ভাস্কর্যে, রঙ্গমঞ্চেও কুত্রাপি কেউই চার্লির বৈচিত্র্য, বিস্তার, গভীরতা, সর্বজনমর্মস্পর্শদক্ষতা দেখাতে পারেননি। এ যুগে শার্লক হোমস পৃথিবীর সর্বত্রই সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু মানুষের কোমলতম স্পর্শকাতরতাকে তিনি তার চরম মূল্য দিতে পারেননি; ওমর খৈয়ামও প্রকৃত ধর্মভীরুকে বিচলিত করতে পারেননি।

চার্লিকে বিশ্লেষণ করি কি প্রকারে?

তাঁর সৃষ্টি, কিংবা তিনি নিজে, এই যে 'লিট্‌ল্ ম্যান', সামান্য জন, যেন পাড়ার জগা, টম্, ডিক্, হ্যারি; 'কেউ-কেটা' তো নয়ই, এক্কেবারে 'কেউ না' কি করে সক্কলকে ছাড়িয়ে এক অসাধারণ জন হয়ে সকলের হৃদয়ে এমন একটি আসন গ্রহণ করলো, যে আসন পূর্বে শূন্য ছিল এবং যেখানে আর কেউ কখনো আসতে পারবে না!

কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি?

ভ্যাগাবণ্ড চার্লি একটি শুকনো ফুল দেখতে পেয়ে সেটি তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগল। ঝাঁট-দিয়ে-ফেলে-দেওয়া ফুল—তার ফুল্ল যৌবন গেছে, সে পথপ্রান্তে অবহেলিত, পদদলিত। সামান্য যেটুকু গন্ধ তখনো তার সঙ্গে সুষুপ্ত ছিল চার্লি তাই যেন তার 'সহৃদয়' নিশ্বাস দিয়ে জাগিয়ে তুলে বুক ভরে নিচ্ছে। এ ফুল কি কখনো বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে—রবীন্দ্রনাথের কবি যে রকম আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তে রাজকন্যার বরমাল্য পেল—সে তার চরম সম্মান পাবে?

এমন সময় রাস্তায় দুষ্ট ছোঁড়ারা মোকা পেয়ে পিছন থেকে চার্লির ছেঁড়া পাতলুনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে শার্টে দিল টান। চচ্চড় করে ছিঁড়ে গেল

পাতলুনের অনেকখানি—এই তার শেষ পাতলুন, এটাও গেল—আর বেরিয়ে এল ছেঁড়া শার্টের শেষ টুকরো।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে ভ্যাগাবণ্ড চার্লি ছোঁড়াদের দিকে তাকালে। তারা তখন 'শুভকর্ম' সমাধা করে ছুটে পালাচ্ছে।

তখন ভ্যাগাবণ্ডের চোখে কী বেদনাতুর করুণ ভাব!

ভিয়েনা, বার্লিন, প্যারিস, প্রাগে আমি বিস্তর থিয়েটার প্রচুর অপেরা দেখেছি, কাব্যে সাহিত্যে টন মণ করুণ রসের বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু ভ্যাগাবণ্ডের সে করুণ চাউনি এদের সবাইকে কোথায় ফেলে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যায়।

আর সেই নীরব চাউনিতে বলছে, 'কেন, ভাই, তোরা আমাকে জ্বালাস? আমি তো তোদের সমাজের উজীর নাজির হতে চাইনে। কুকুর বেড়ালটাকে পর্যন্ত আমি পথ ছেড়ে দিয়ে কোনো গতিকে দিন গুজরান করছি। আমায় শান্তিতে ছেড়ে দে না, বাবারা!' তারপরে যেন দীর্ঘনিশ্বাস—'হে ভগবান!'

এখানেই কি শেষ? তা হলে চার্লি দস্তয়েফস্কির মতো সুদ্ধমাত্র করুণ রসের রাজা হয়ে থাকতেন।

অন্ধ ফুলওয়ালী মিষ্টি হেসে চার্লিকে একটি তাজা ফুল দিতে যাচ্ছে। তাকে? চার্লিকে? অবিশ্বাস্য!

আইনস্টাইন একবার কোনো শহরের বড় স্টেশনে নেমে দেখেন বিস্তর লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে—যেন তাঁকে অভ্যার্থনা জানাতে চায়। বিনয়ী আইনস্টাইন শুধু পিছনের দিকে তাকান আর ডাইনে বাঁয়ে সরে যান। নিশ্চয়ই তাঁর পিছনে কোনো ডাকসাইটে কেষ্ট-বিষ্টু আসছেন, সবাই এসেছে তাঁকেই বরণ করতে, আইনস্টাইন শুধু আনাড়ির মতো মধ্যিখানে বাধার সৃষ্টি করছেন।

কই? কেউ তো নেই? রাস্তা একদম ভোঁ ভোঁ—কলকাতার রেশনশপের গুদোমের মতো। এরা এসেছে আইনস্টাইনের জন্যই।

আমাদের ভ্যাগাবণ্ডটিও পিছনে তাকালে। এক্‌স্‌ট্রিমস মীট্‌। আইনস্টাইন খ্যাতির সর্বোচ্চ ধাপে, চার্লি নিম্নতম মাপে।

ফুল পেয়ে চার্লির মুখের ভাব! স্মিত হাস্যে মুখের দুই প্রান্ত দুই কানে ঠেকে গিয়েছে, শুকনো গালদুটো ফুলে গিয়ে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো চেপে ধরেছে. চোখের কোণ থেকে রগ পর্যন্ত চামড়া কুঁচকে গিয়ে কাকের পায়ের নকশা ধরেছে, সে চোখ দুটো কিন্তু বন্ধ—আমার যেন মনে হল ভেজা-ভেজা, ঠিক বলতে পারবো না, কারণ আমার চোখও তখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

সর্বক্ষণ ভয় হচ্ছিল, এইবার না চার্লি ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলে!

কে বলে সংসারে শুধু অকারণ বেদনা, নিদারুণ লাঞ্ছনা। পকড় কে লে আও উস্কো। এলিসের রানীর হুকুম, 'অফ্ ফ্ ফ্ উইদ্ হিজ্ হেড্'।

মানুষের কলিজায় চার্লি পুকুর খোঁড়েন কি করে? দুঃখ, সুখ, করুণা, কৃতজ্ঞতা এসব রস আমাদের কলিজার গভীরতম প্রদেশে চার্লি সঞ্চারিত করেন কোন্ পদ্ধতিতে?

এক ইরানী কবি বলেছেন, 'সব জিনিসের হদ্দ—অর্থাৎ সীমা—জানাটাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার লক্ষণ।'

অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায়, তাঁর অভিনয়ে চার্লি বাড়াবাড়ি করেন না। কারণ, কে না জানে, একঘেয়েমির চূড়ান্তে পৌঁছয় মানুষ যখন ভ্যাচর-ভ্যাচর করে সবকিছু বলতে চায়, সামান্যতম জিনিসও বাদ দিতে চায় না।

তাই অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন বলেছেন, 'ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করবে।' ধ্বনি বলতে তাঁরা ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত, সাজেস্‌টিভ্‌নেস অনেক কিছুই বুঝেছেন।

যথা:

কুলটা রমণী পথিককে বলছে, 'হে পথিক, এই ঘরে রাত্রিকালে আমার বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি শয়ন করেন, ঐ ছোট ঘরে আমি একা থাকি, আমার স্বামী বিদেশে। তুমি এখন যাও।'

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ চার্লি যেটুকু অভিনয় করেন, সে তো করেনই; সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই অনেকখানি অভিনয় করে নিই।

হালে চার্লি সুখবর দিয়েছেন, তিনি আবার সেই 'লিটল ম্যা'ন', সেই ভ্যাগাবণ্ডকে পুনর্জন্ম দেবেন। তাঁর যা বলবার তিনি তারই মারফতে শোনাবেন। শুনে আমরা উল্লসিত হয়েছি।' 'মঁসিয়ো ভের্দু,' 'লাইম-লাইট' উৎকৃষ্ট অতুলনীয় রসসৃষ্টি, কিন্তু আমরা সেই ভ্যাগাবণ্ডকে বড্ড মিস্ করছি।

চার্লি ভ্যাগাবণ্ডকে বর্জন করেছিলেন কেন?

হয়ত ভেবেছিলেন সব কথা ঐ একই জনের মারফতে বলা চলে না। আমাদের ভ্যাগাবণ্ডের পক্ষে সবাইকে তো বিষ খাইয়ে খাইয়ে—'বিজ্‌নেস ইস্ বিজনেস্' বলে এলোপাতাড়ি বিষবাহনন করা যায় না—তাই ভের্দুর সৃষ্টি।

ঠিক এই কারণেই কোনান ডয়েল শার্লক হোমস্‌কে মেরে ফেলে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সৃষ্টি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও তাই গদ্য কবিতা ধরেছিলেন। এই উদাহরণটাই ভালো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পদে পদে দেখলেন তাঁর কবিতার পদে পদে মিল এসে যাচ্ছে, ছন্দ এসে যাচ্ছে। যাবেন কোথায়? পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস। নাচার হয়ে মিলগুলো লাইনের শেষে না এনে মাঝখানে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন—মাংস ঢাকা দিয়ে শাক খাওয়ার মতো।

শেষটায় বললেন, 'তুত্তোচ্ছাই! যাই ফিরে ফের মিল ছন্দে।' রবীন্দ্রনাথের 'গবিতা' নিকৃষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তম কবিতা। এই বাঙলা দেশে একমাত্র তিনিই সার্থক 'গবি'। কিন্তু সোজা কথা—তিনি বুঝে গেলেন যে কবিতার মিল ছন্দ বজায় রেখেও তাঁর যা বক্তব্য তা তিনি বলতে পারবেন। ফিরে গেলেন কবিতায়।

চার্লি যখন ভেঢ়ু করছেন, তখন আমরা পদে পদে দেখতে পাচ্ছি তাঁর পিছনে ভ্যাগাবণ্ডকে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাকে লুকোবার জন্যে—রবীন্দ্রনাথ যে রকম মিল লুকোবার চেষ্টা করেছিলেন গবিতায়—কিন্তু আমরা তাকে বার বার দেখতে পাচ্ছি। বারবার মনে হয়েছে, 'আহা এ জায়গায় যদি আমাদের ভ্যাগাবণ্ডটি থাকতো তবে সে সিচুয়েশনটা কি চমৎকারই না এক্সপ্লয়েট করতে পারতো!'

চার্লিও সেটা বুঝেছেন। যে ভ্যাগাবণ্ডকে এতদিন একটুখানি জিরিয়ে নিলেন, তাকে চার্লি আবার ঘরের ভিতর থেকে টেনে আমাদের চোখের সামনে তাকে দিয়ে বাউণ্ডলী করাবেন

সুসংবাদ!!

১৯৫৭

ফিল্মের ভাষা

থিয়েটারের কপাল মন্দ, পাঠান-মোগলের আপন দেশে ওটার রেওয়াজ নেই। তাই পাঠান রাজারা এদেশে জমে বসার পর গাইয়ে-বাজিয়েদের ডেকে পাঠালেন, পটুয়াদেরও ডাক পড়লো, নাচিয়েরাও বাদ গেল না আর এমারৎ বানানেওলাদের তো কথাই নেই। সংস্কৃত যদি তখন এ-দেশের চালু এবং সহজ ভাষা হত; তাহলে সংস্কৃত নাট্যও যে বাদশার দরবারে কদর পেত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ হিন্দী কদর পেয়েছিল এবং এ-দেশে বাঙলা কদর পাওয়ার ফলে পরাগল খান, ছুটিখানের মহাভারত লেখা হয়েছিল।

সংস্কৃতে লেখা আমাদের নাট্য ঠিক মুসলিম আগমনের শুরুতে এদেশে কতখানি চালু ছিল বলা কঠিন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, সংস্কৃত তখন মৃত ভাষা, ওসব নাট্য তখন প্রায় উঠে গিয়েছে। আমি কিন্তু কিঞ্চিৎ ভিন্ন মত পোষণ করি।

পূর্বেই স্বীকার করেছি, পাঠান আমলে সংস্কৃত মৃত ভাষা, কিন্তু সংস্কৃত নাটক তো সম্পূর্ণ সংস্কৃতে লেখা নয়। তুলনা দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করি।

শেক্স্‌পিয়র জানতেন, তিনি রাজা-রাজড়া এবং শিক্ষিতজনদের জন্যই আপন নাটক লিখছেন। কিন্তু অন্য একটি তত্ত্বও বিলক্ষণ জানতেন যে তাঁদের সংখ্যা কম, এবং বেঞ্চি গ্যালারি ভরভরাট ক'রে নাটকটাকে জম-জমাট করে টাঙাওলা-বিড়িওলার দল। কাজেই তাঁর নাটকে ওদেরই মতো চরিত্র ওদেরই ভাষায়ই কথা কয়, বিশেষ করে ভাঁড়টি সব সময়ই রাজা-প্রজা দু'দলকেই খুশি করতে জানে।

ঠিক সেইরকম গুপ্তযুগের কালিদাসও জানতেন যে, তাঁর যুগের 'টাঙাওলা' 'বিড়িওলা' সংস্কৃত বোঝে না, অথচ রাজা-রাজড়ারা নাটক চান সংস্কৃতে। ওদিকে তিনি শেক্স্‌পিয়রের মতো বুঝতেন যে, জনসাধারণকে খুশি না করে কোনো নাটকই বক্স্‌-আপিস ভরতে পারে না। গোলাপফুল খাপসুরৎ জিনিস। কিন্তু পাতা-কাঁটা ওটাকে খাড়া করে না ধরলে ওটা শুধু শূন্যে শূন্যে ঝুলতে পারে না। তাই তিনি তাঁর নাটকে ব্রাহ্মণ আর রাজা ছাড়া আর সবাইকে দিয়ে কথা কওয়াতেন

তখনকার দিনের চালু ভাষা প্রাকৃতে। আর শুধু কি তাই? রাজার সংস্কৃতে শোধানো প্রশ্নের উত্তর দাসী যখন প্রাকৃতে দিত তখন কালিদাস তার উত্তরের ভিতর রাজার প্রশ্নটি এমনভাবে জড়িয়ে দিতেন যে সংস্কৃত না-জাননেওলা শ্রোতাও দুই পক্ষের কথাই পরিষ্কার বুঝে যেত। দাসীর তুলনা দিয়েই যদি জিনিসটে বোঝাতে হয় তবে বলতে হবে, এ-যেন 'বাঁদীকে ঠেঙিয়ে বিবিকে সোজা রাখার' মতো রাজা এবং প্রজা উভয় দর্শককে সোজা রাখা।

তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কালিদাসের নাটক সর্বজনপ্রিয় ছিল।

তারপর প্রশ্ন উঠতে পারে, ঠিক মুসলমান আগমনের প্রাক্কালে জনসাধারণ কি কালিদাসের আমলের প্রাকৃত বুঝতো? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো এলেম আমার পেটে নেই। তবে তার একশ' বছর পেরবার পূর্বেই আমীর খুসরো যে-হিন্দী ব্যবহার করেছেন সে-হিন্দী অনেকটা ঐ প্রাকৃতের মতোই। এবং এখানে আরো একটি কথা আছে। জনসাধারণ ততদিনে কালিদাসের নাটক দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এবং নিরক্ষর দর্শক একটা ফিলিম তিন বার দেখবার পর যে কতখানি মনে রাখতে পারে সে-কথা শিক্ষিত জন জানেন না। আমার এক চাকর (বস্তুত এই গণতন্ত্রের ইন্‌কিলাবী যুগে 'মনিব' বলাই ভালো) পাড়াতে নয়া ছবি এলেই একটানা সাত দিন ধরে সেই ছবি দেখতে যেত। আমি অবাক হয়ে ভাবতুম, নাগাড়ে সাতদিন ধরে একই ছবি দেখে কি করে? পরে তার গুনগুনোনি থেকে বুঝলুম, ছবির চোদ্দখানা গানই সে রপ্ত করতে চায় এবং করে ফেলেছেও! অনেক হিন্দী গানের বিস্তর কথা না বুঝতে পেরেও! অবশ্য আমার এ-মন্তব্যে ভুল থাকতেও পারে। কারণ আমি এ-জীবনে তিনখানা হিন্দী ছবিও দেখিনি এবং অন্য কোনো পুণ্য করিনি বলে এই পুণ্যের জোরেই স্বর্গে যাবো বলে আশা রাখি। তবে বলা যায় না, সেখানে হয়ত হিন্দী ছবি দেখতে হবে! কারণ এক ইরানী কবি মহাপ্রলয়ের পরে যে শেষ বিচার হবে তারই স্মরণে অনেকটা এই ভয়ই করেন,—

"শেষ-বিচারেতে খুদার সমুখে দাঁড়াবো তো নিশ্চয়,
মানুষের মুখ আবার দেখিব! এইটুকু মোর ভয়।"
"মরা ব্‌ রূজ-ই কিয়ামৎ গমী কি হস্ত্‌ ঈন্‌ অস্ত
কি রূ-ই মরদুমে আলম্‌ দু বারা বায়দ দীদ"*

---

* The only thing which troubles me about the Resurrection day is this,
That one will have to look once again on the faces of mankind!

যদি প্রশ্ন শোধান সে কি করে হয় ?—তুমি হিন্দী ফিলিম্ বর্জন করার পুণ্যে স্বর্গে গেলে ; সেখানে আবার তোমাকে ঐ 'মালই' দেখতে হবে কেন ? তবে উত্তরে নিবেদন, কামিনীকাঞ্চনসুরা বর্জন করার ফলে আপনি যখন স্বর্গে যাবেন তখন কি ইন্দ্রসভায় ঐ গুলোরই ছড়াছড়ি দেখতে পাবেন না ?

তখন যদি আপনি এককোণে মুখ গুমড়ো করে বসে থাকেন তবে কি সেটা খুব ভালো দেখাবে ?

থাক্। কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম ! মূর্খকে চটালে এই তো বিপদ। আবোল-তাবোল বকে।

মোদ্দা কথা এই, পাঠান-মোগল যুগে নাট্যাভিনয় রাজানুকম্পা পেল না বলে আমরা এখনো তার খেসারতি ঢালছি। এবং দ্বিতীয় কথা—নাট্যে, ফিলিমে ভাষা জিনিসটাকে অবহেলা করলে ক্ষতি হয়। এমন কি যদিও বহু গুণী বলে থাকেন 'সাইলেন্স্ ইজ গোল্ডেন' তবু সাইলেণ্ট ফিলিম চললো না। বাঙলা ফিলিম যখন সে সাইলেন্স্ ভাঙলে তখন থেকে আজ পর্যন্ত যে-ভাষা সে বললে তারই দিকে এ-প্রবন্ধের নল চালনা।

সাতশ' বছর পরে ইংরেজ আমলে হল ঠিক তার উল্টো। কলা জগতে ইংরেজের প্রধান সম্পদ তার থিয়েটার। শেক্স্পিয়রের মতো নাট্যকার নাকি পৃথিবীতে নেই। ইংরেজ বললে, 'চালাও থিয়েটার।' কিন্তু প্রশ্ন, কে করবে থিয়েটার ?

ইতিমধ্যে বাঙালী বিলেত যেতে আরম্ভ করেছে। সেখানে একাধিক নেশার সঙ্গে সে থিয়েটারের নেশাটাও রপ্ত করে এল।

বাঙলা গদ্য এবং পদ্য তখন দুইই বড় কাঁচা।

আর জনসাধারণের ভাষা ? তারও মা-বাপ নেই। একদিকে শেষ মোগলের ফার্সী উর্দুর শেষ রেশ, অন্যদিকে সুতোনুটি-গোবিন্দপুরের ঐতিহ্যহীন স্ল্যাঙ—দুয়ে মিলে তার যা চেহারা সেটা কিছুদিন পরে পাওয়া যায় হুতোমের নকশায়। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের অতি ভদ্র অতি মার্জিত ভাষা।

এ-যুগের নাটকের ভাষা তাই শব্দতত্ত্বের স্বর্গভূমি। কিন্তু নাটকে যে স্বচ্ছন্দ ভাষার প্রয়োজন তার বড়ই অভাব। সব নাট্যকারই যেন ঠিক মানানসই ভাষাটির জন্য চতুর্দিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।*

* শুনেছি সর্বপ্রথম নাকি এক রাশান এদেশে থিয়েটার করেন। তিনি তখন ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা কতখানি পেয়েছিলেন, তার প্রভাব পরবর্তী যুগের বাঙলা থিয়েটারে কতখানি পড়েছিল, এ-সব প্রশ্ন ভাষার বিচারে অবান্তর।

মাইকেলের পৌরাণিক নাট্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা; তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'তে কলকাতার স্ল্যাঙ; 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা'তে গ্রামাঞ্চলের একাধিক ভাষা; এবং দীনবন্ধু মিত্রের ভাষাতে বিদ্যাসাগরী ও গ্রাম্য দুইই।

নীলদর্পণ সে-যুগের বাঙলার বেদনা প্রকাশ করেই যে বিখ্যাত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগরী ভাষা ও মুসলমান চাষার ভাষা এ-দুয়ের সম্মেলনও তার জন্য অনেকখানি দায়ী। অবশ্য শুধুমাত্র ভাষার বাহার যদি শুনতে চান তবে 'বুড়ো শালিকের' মতো নাটক হয় না। হিন্দু গৃহস্থ, হিন্দু চাকর, মুসলমান চাষা, চাষার বউ, হিন্দু দাসী—এদের সকলের আপন আপন ভাষার সূক্ষ্মতম পার্থক্য মাইকেল যে কী কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে কোথাও নেই। নাটক হিসেবে এ-বই উত্তম—সাহিত্য হিসেবে ভাষার বাজারে এ-বই কোহিনুর।

অবাঙালীর জন্য পার্শী থিয়েটার কবে প্রতিষ্ঠিত হয় আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু বিস্তর বাঙালীও সেখানে যেত ও উর্দু-গুজরাতীতে মেশানো নাটক বুঝতে যে তাদের বিশেষ অসুবিধে হত না সে-তথ্য কিছু অজানা নয়। 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' জাতীয় জনপ্রিয়, বাঙলা-উর্দুতে মেশানো খিচুড়ি ঠাট্টা ব্যঙ্গের ভাষা কিছুটা হুতোম আর কিছুটা পার্শী থিয়েটারের কল্যাণে।

ইতিমধ্যে ভাষাসমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যায় বঙ্কিমের কল্যাণে। বঙ্কিমের ভাষানির্মাণে কোন্ কোন্ উপাদান আছে সেকথা আজ ইস্কুলের ছেলে পর্যন্ত জানে। ডি. এল. রায় শ্রেণী এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

এইখানে এসে আমাদের সবাইকে—বিশেষ করে রবীন্দ্রশিষ্যদের একটু বিপদে পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষা যে তাঁর ছোট গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন কথ্য ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছে সে-কথা আমরা সবাই জানি, এবং তার প্রভাব যে আমাদের রঙ্গমঞ্চেও পড়েছে সেও প্রতি মুহূর্তে কানে বাজে। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর নাটকের ভাষা এত বেশি মার্জিত, এত বেশি সূক্ষ্ম যে নাট্যশালার আটপৌরে কাজ তা দিয়ে চালানো যায় না। তাই বোধহয় তাঁর নাটকের মূল্য সাহিত্য হিসাবে যত না সম্মান পেয়েছে এবং পাবে নাট্য হিসাবে ততখানি পায়নি, পাবে কি না সন্দেহ।

*　　*　　*

গোড়ার দিকে ফিলিমের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। কারণ সে তখন ভাষণ না করে শোভা বর্ধন করতো। টকি আসার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীল চিত্রচালককেই

মনস্থির করতে হল টকির ভাষা ও উচ্চারণ হবে কি ? এ-মুশকিলের একটা অতি সহজ সমাধান আছে। শরৎবাবুর 'নিষ্কৃতি' করতে হলে তাঁর ডায়ালগের ভাষা দিলেই হল। এর আর ভাবনা কি ?

মুশকিল আসান অত সহজে হয় না। প্রথমত কোনো কোনো বর্ণনা ডায়ালগে প্রকাশ করতে হয় ; তখন উপায় ? সেটা তৈরি করে দেবে কে ? সে-কলম আছে কার ? রবীন্দ্রনাথের বারোটি গান নিয়ে যখন দম্ভী লেখকেরা মাঝখানে মাঝখানে 'আপন' গদ্য জুড়ে দিয়ে কিমপিয়ার (কঁপের) করেন, এবং দুই পাকা গানের মাঝখানে সেই কাঁচা বাঙলা শুনতে হয় তখন মনে হয় না, থাক্, বাবা, বাড়ি যাই ?

কিন্তু সেইটেই প্রধান শিরঃপীড়া নয়। আসল বেদনা অন্যখানে। বইয়ের লেখা ডায়ালগ আর সিনেমায় উচ্চারিত কথাবার্তা এক জিনিস নয়। বই বন্ধুজনের সঙ্গে পড়ে শোনানো যায়—তার পাল্লা অদূর অবধি। নাট্যে, পর্দায় সেটা অত্যধিক 'সাহিত্যিক'। অবশ্য নিছক ফিলিমের জন্য লেখা রাবিশের কথা এখানে হচ্ছে না।

অন্যদিকে সিনেমার ভাষাতে যদি কোনো সাহিত্যিক মূল্যই না থাকে তবে সে ইস্থেটিক পর্যায়ে উঠতে পারবে না। এই হল আমাদের দু-মুখো সাপ, ডিলেমা, প্যারাডক্স্—যা খুশি বলতে চান বলুন।

প্রথম যখন মানুষ পাথরের বাড়ি তৈরি করতে শিখল তখন পূর্বতর যুগের কাঠের বাড়ির অনুকরণে পাথরের বাড়ি তৈরি করতো ; বাঙলা দেশে ইট চালু হওয়ার পর প্রথমটায় সে খড়ের চালের অনুকরণ করেছে ; বেতারের বয়স হয়েছে —এখনো সে নাটক করার সময় 'থিয়েডারের' (থিয়েটারের নয়) অনুকরণ করে —ফিলিম কেন অনুকরণ করতে যাবে ?

ক্রন্দসী

—"শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত ; সত্বর পশিল গৃহ মাঝে
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্ত কপোল। কহে রক্ষী হাস্য ভরে,
'অতিশয় অসময়ে অভাজন 'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ'।"

ওঃ ভাষার কী জেল্লায়! 'অতিশয় অসময়ে অভাজনে অযাচিত অনুগ্রহ—' 'অ'-য়ে 'অ'-য়ে ছায়লাপ! তা-ও ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেন্‌রেল্‌ অব্‌ পুলিসের মুখে!

গল্পটি সকলেরই জানা। রবীন্দ্রনাথ এটি কণেবর জাতক থেকে নিয়েছেন। আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে রাজ্যপালের মেয়ের আংটি হারিয়েছে। তুমুল কাণ্ড। স্বয়ং আই. জি. যখন চোর ধরে গবর্নমেণ্ট হৌসের দিকে যাচ্ছেন তখন মনে করুন মাতাহরি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি কি তখন 'উতলা' এবং 'রোমাঞ্চিত' হবেন না? তাঁর মুখে কি তখন খৈ ফুটবে না, চোখ দুটো পল্‌কা নাচ নাচবে না! অবশ্য সামান্য 'অ' দিয়ে কবিত্বের প্রকাশ—রবীন্দ্রনাথ অতি মোলায়েম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পুলিস এর বেশি আর কি কবিত্ব করবে? তবে কিনা রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতাটি লিখেছিলেন সেদিনের তুলনায় আজকের পুলিস বড্ড বেশি লেখা-পড়া করে আপন সর্বনাশ টেনে আনছে!

আমার অবস্থা হয়েছিল বজ্রসেনের। সে চোর।

আমি তখন বোম্বায়ে। আমার এক বন্ধু ব্যাঙ্কার। নাম জভেরী—অর্থাৎ জহুরীর গুজরাতী সংস্করণ। এক বাঙালী 'ফিলিম-এস্টারের' শাদী। তিনি তাঁর ব্যাঙ্কার জভেরীকে নেমন্তন্ন করেছেন। জভেরী ব্যাচেলর ; আমার সঙ্গে চম্‌ করে। স্টার সেটি জানতেন। লখনৌয়ে প্রতিপালিত বঙ্গরমণী এটিকেট-দুরুস্ত

হয়, যত না প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি। বিবেচনা করি আমারও নিমন্ত্রণ ছিল—কিন্তু কসম খেতে পারবো না।

রোশনাই বাদ্যি বাজনা যা ছিল তা এমন কিছু মারাত্মক খুনিয়া ধরনের নয়। কন্যা কুরূপা হলে এসবের প্রয়োজন। ইংরিজিতে বলে লিলি ফুলকে তুলি দিয়ে রঙ মাখাতে হয় না,—আজকের দিনের ভাষায় লিপিস্টিক্-রূজ্ মাখাতে হয় না। যাঁরা আছেন এবং যাঁরা আসছেন তাঁদের এক এক জনই এক ধামা লিলি—না, দুই ধামা।

দরিদ্র আবুহোসেন ঘুম ভাঙতে দেখে, সে সুন্দরীদের হাটে। কূজনে গুঞ্জনে গন্ধে অনুমান করলে সে খলীফা হরুন-অর-রশীদের হারেমের ভিতর। সাক্ষাৎ পরীস্তান।

আর আমি? অধুনা মৃত ভাস্কর এপ্‌স্টাইন আমাকে 'বৃদ্ধ নিগ্রোর' মডেল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুন্দরীরা আমাকে অবহেলা করেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন, আমিও বুঝি ফিলিম স্টার—'সুটিঙে'র ('শুটিঙ্' সাদামাটা সিনেমা বাবদে অজ্ঞজনের শুদ্ধ উচ্চারণ!) ড্রেস না ছেড়েই দাওয়াতে এসেছি।

আমি ভালো করেই জানি, আপনারা সব স্টারদেরই চেনেন, কিন্তু সবাইকে এক সঙ্গে দেখেছেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। তদুপরি আরেকটি ছোট কথা আছে। তারকার তুলনা দিয়েই নিবেদন করি। অরুন্ধতী আকাশের ক্ষুদ্রতম তারকা। কিন্তু তিনি বশিষ্ঠের পাশে বসে যখন সপ্তর্ষির সাতটি তারকার সম্মেলনে দেখা দেন তখন মনে হয় ইনি না থাকলে সপ্তর্ষির সাতটি তারকাই মিথ্যা হতেন।

শাদীর মজলিসে তাই ক্ষুদ্রতম তারকাটিও চিত্তহারিণী হয়ে দেখা দিয়েছিলেন।

এলেন, মনে করুন,—নামগুলো একটু উল্টেপাল্টে দিচ্ছি—শমশাদ বানু লায়লা। পরনে সাটিনের পাজামা পায়ের এক একটি ঘের অন্তত দু'হাত। স্বচ্ছন্দে যে-কোনো বঙ্গসন্তানের তিনটি পাজামা বা পাঁচটি পাতলুন হতে পারে। শমশাদ বানুর কোমরটি বঙ্গরমণীর কাঁকনের সাইজ। তাই কোমর থেকে পর্দার মতো ফোল্ডে ফোল্ডে সে পাজামা নেমে আসাতে বোঝা গেল না তিনি মাডাম পম্পাডুরের ফ্রক পরেছেন, না ভাওয়ালের জমিদার বাড়ির লুঙ্গী পরেছেন, না ইরানী বেদেনীদের তাম্বু-পানা ঘাঘরা পরেছেন। আসলে নাকি একে লখনৌঈ বড়ী মুরী পাজামা বলে। তা সে যে নামই হোক, আমার মনে হল আমি যেন খাসিয়া পাহাড়ে নূশমই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে। বিজলির আলো প্রতি

কোল্ড বেয়ে যেন গলা রুপোর মতো ঝরনা ধারায় পায়ের কাছে নেমে এসে শতত্তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে শমশাদ বানু লয়লা যেন আস্বচ্ছ দুগ্ধকুণ্ডে কটিতটটি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এর সঙ্গে সে-যুগে লম্বা কুর্তা পরা হত। ইনি পরেছেন কঞ্চুলিকা বা চোলী। আমি মাত্র একবার সেদিকে তাকিয়েছিলুম।

মোগল বাদশা মারা গেলে যে ছেলে রাজা হত সে অন্যদের চোখ চোখেরই সুরমা প্রার শলা দিয়ে কানা করিয়ে দিত। আমার দুটি চোখই যেন কানা হয়ে গেল। ও রকম কিংখাব আমি দেশ-বিদেশের কোনো জাদুঘরেও দেখিনি! সোনা রুপোর জরি দিয়ে সে কিংখাবে এমনই কারুকার্য করা হয়েছে যে কিংখাবের একটি টানা-পোড়েনের রেশমী সুতোও দেখা যাচ্ছে না।

ঘাঘরাটি ছিল যেন শীতল ঝরনা; এ যেন সাক্ষাৎ অগ্নিকুণ্ড।

চোলির হেথাহোথা দু-একটি মুক্তো গাঁথা। যেন বহ্নি নির্বাপিত করার জন্য ক্ষুদ্র হিমিকার নিষ্ফল প্রয়াস।

দু' কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ ওড়না।

সেই ছেলেবেলায় দাদীমাকে বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ শাড়ি পরতে দেখেছি। আর আজ তার-ই ওড়না। অতি সূক্ষ্ম মসলিনের এখানে ওখানে দুটি দুটি করে বুলবুলের চোখের (চশ্‌ম্‌) মতো ফুটো করে সে দুটি অতি ফাইন মুগা সিল্ক দিয়ে বোতামের ফুটোর মতো কাজ করা হয়। এ রমণীর রুচি আছে। ক্ল্যাসিক্‌স্‌ পড়ে। বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ কালিদাসের যুগের, তার মূল্য ইনি জানেন।

আশ্চর্য! এলো খোঁপা। গান্‌মেটল রঙের কৃষ্ণনীল চুলের খোঁপাটি কাঁধে শুয়ে যেন কৃষ্ণকরবীর স্তবক শুভ্র ফুলদানিতে ঘুমিয়ে আছে।

* * *

হঠাৎ দেখি এক চোখ-ঝলসানো সুন্দরী, বিধবার থান পরে! ইনি বিয়ের পরবে কেন? আমাদের দেশে তো কড়া বারণ। তখন আবার দেখি তাঁর হাতে ফেনা-ভর্তি শ্যাম্পেনের গেলাস। নাঃ, ইনি সদ্য স্টুডিয়ো থেকে শুটিং অর্ধসমাপ্ত রেখে এসেছেন।

* * *

আরো অনেকেই ছিলেন। বেবাক বর্ণনা দিতে হলে তামাম পুজো সংখ্যাটা আমাকেই লিখতে হয়। খর্চায় পুষাবে না—সম্পাদক জানেন।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণলাল জভেরী এসে আমাকে নিয়ে চললেন সেই তারকা

যজ্ঞশালার প্রান্তদেশে অনাদৃতা ঊর্মিলার অবস্থা থেকে টেনে হিঁচড়ে অন্ত প্রান্তে। কি ব্যাপার? জভেরী উত্তেজনার মধ্যিখানে ইংরিজি ভুলে গিয়ে গুজরাতীতে কি যেন 'সুঁ সুঁ' করলে। কে যেন আমাকে ইণ্টারভ্যু দেবে। আমি বেকার। বিধি তবে দক্ষিণ। অন্ত প্রভাতের সবিতা প্রসন্নোদয় হয়েছেন। আম্মো ইস্টার হব।

শমশাদ বানু লায়লা মৃদু হাস্য করলেন। ফিল্ম্-স্টারের ধবধবে সাদা দাঁত নয়। গোলাপীর চেয়েও গোলাপী রঙের অতি ক্ষীণ একটি ফিল্ম্—ফিল্ম্-স্টারের দাঁতের উপর। কী সুন্দর! তাই বুঝি কালিদাস তাঁর নায়িকার দাঁতের সঙ্গে রাঙা অশোকের তুলনা দিয়েছেন—শুভ্র বন-মল্লিকার সঙ্গে দেননি। আগেই বলেছি, ইনি ক্ল্যাসিক্স্। পানের রস গ্রহণ করতে জানেন। অন্য পান কিন্তু জানেন না। হাতে লেমন-স্কোয়াশ।

শুধালেন, 'আপনি দার্শনিক?'

আমি জভেরীকে ধমক দিয়ে বললুম, 'জভেরী!'

জভেরী ভীরু। বললে, 'আমি কিচ্ছু বলিনি।'

আমি বীবী সাহেবাকে চালাকি করে শুধালুম, 'আমাকে কি এতই বিজ্ঞ মনে হয়?'

'বুদ্দু মনে হয়। বিজ্ঞ মনে হয় স্লিস্টারকে, ব্যাঙ্কারকে, পোকার খেলাড়ীকে।'

বাধ্য হয়ে বললুম, 'না। আমি দার্শনিক নই। আমি দর্শনের শত্রু ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করি।'

শমশাদ বানুর মুখে তৃপ্তির চিহ্ন ফুটলো।

এত দিনে আমার নীরস শাস্ত্রচর্চা ধন্য হল।

বললেন, 'সে তো আরো ভালো। আমি তাই খুঁজছিলুম। আচ্ছা বলুন তো—' বলে তিনি যেই একটু থেমেছেন, আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'বীবী সাহেবা, এই জায়গা কি ধর্ম-চর্চার পক্ষে প্রশস্ত?'

অবহেলার সঙ্গে বললেন, 'নয় কেন? পাপীরাই তো ধর্মচর্চা করবে। ধার্মিকদের তো ওসব হয়ে গিয়েছে। তেলো মাথায় ব্রিলেণ্টাইন? সে-কথা থাক্। আমি শুধোতে চাই, কেউ যদি মরে যায় (আমার মনে হল শমশাদ কেমন যেন একটু শিউরে উঠলেন) তবে আমি মরে গেলে তাঁকে দেখতে পাবো কি?'

আমি শুধালুম, 'কোন্ ধর্ম মতে?'

'সে আবার কি?'

'আমি 'তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্র' চর্চা করি।'

'তার মানে?'

'এই মানে ধরুন, পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, মেলা ধর্ম আছে। আমি প্রত্যেক ধর্মের জন্ম, যৌবন, বর্তমান অবস্থা,—কে কি বলে তাই পড়ি। যেমন প্রত্যেক দেশের ইতিহাস হয়, তেমনি প্রত্যেক ধর্মেরও ইতিহাস হয়।'

একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'আমি অতশত বুঝি না। আমি ফিল্মে কাজ করি, আমি পণ্ডিত নই। আমি জানতে চাই, এত সব ধর্ম পড়ার পর এ-বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত, পার্সনাল মতটা কি?'

মহা ফাঁপরে পড়লুম। বললুম, 'আমি কখনো ভেবে দেখিনি। মুসলমান ধর্ম বলে—।'

বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক্। আপনি তা হলে একটি আস্ত চিনির বলদ। ধর্ম বয়ে বেড়াচ্ছেন—কখনো কাজে লাগাননি।'

আমি বললুম, 'ধর্ম কি মসলা বাটার জিনিস? নামাজের কার্পেট দিয়ে কি মানুষ বিছানা বাঁধে?'

অতি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'না। কিন্তু নামাজের কার্পেটে মানুষ নামাজ পড়ে; ওটা শিকেয় তুলে রাখে না।'

আমি বললুম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে ফিল্ম-স্টারদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল। আপনি নিশ্চয়ই বিস্তর লেখাপড়া করেছেন।'

'কী আশ্চর্য! এ-তো কমন্-সেন্সের কথা। এটা না থাকলে প্রডুসার-ডিরেক্টর-এডমায়ারার-লাভারের দল আমাকে কুটিকুটি করে ফেলতো না। ওসব কথা থাক্। আপনি আমার কথার উত্তর বেশ চিন্তা করে দিন।' তারপর জভেরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওহে জভেরী, ওঁকে একটা শ্যাম্পেন দাও না?'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'থাক্। আপনার পাল্লায় পড়ে আমার বিশ বছরের নেশা কপ্পূর হয়ে গেছে। আড়াই ফোঁটাতে আর কি হবে, লায়লীবানু।'

একটু হেসে বললেন, 'আপনার মুখে 'লায়লী' বেশ মিষ্টি শোনায়।'

সর্বোনাশ! সর্বোনাশ!! এ যে ডবল এটাক। পিনসার মুভমেণ্ট।

ওড়নাটি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চেয়ারে যে ভাবে চেপে বসলেন

তাতে বুঝলুম যে এর গায়ে কাবুলী রক্ত আছে। উত্তর না নিয়ে উঠবেন না।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, চোখ দুটি বন্ধ,—বড় শান্ত প্রশান্ত নিস্তব্ধ ভাব। ঐ বেশ পরা না থাকলে মনে হত তপস্বিনী, কঠোর ব্রতচারিণী সূফী রমণী।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার মনে হয়,—' থামলুম। কোনো উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ পর ফের বললুম, 'আমার মনে হয়—'

অল্প একটু 'উঁ' শুনতে পেলুম।

'—যে পুণ্যবান লোকের কোনো কামনা আল্লাতালা অপূর্ণ রাখেন না।'

* * *

আমি জানি, চতুর্দিকে তখন হৈ হুল্লোড়। কিন্তু আমার মনে হল যেন আমি মরুভূমির মাঝখানে দুপুর রাত্রে জেগে উঠেছি। দিবাভাগের আতপতাপে দগ্ধ সর্ব কাফেলার মানুষ উট গাধা ঘোড়া সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আকাশের নৈস্তব্ধ্যকেও যেন মরুভূমির নৈঃশব্দ্য হার মানিয়েছে। কোথা থেকে এল এ শান্তি, এ বিধান? তাকিয়ে দেখি, লায়লার মুখ থেকে।

ততক্ষণে জভেরী শ্যাম্পেন নিয়ে ফিরেছে।

লায়লা উঠে বললেন, 'আপনার কথা ঠিক।'

তারপর জভেরীকে রাজেশ্বরীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি থাকো। আমি এঁকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

গাড়িতে একটি কথাও হয়নি।

আমি নামবার সময় তাঁকে 'আদাব আরজ, খুদা হাফিজ' বললুম। তিনি সযত্নে আমার ডান হাত আপন দুহাতে ধরে মৃদু চাপ দিলেন। সে চাপে ছিল বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা। ফিল্ম-স্টারের হাতের চাপ আমি এর আগে, এখন এবং এর পরেও, কখনো পাইনি।

মধ্যরাত্রি অবধি খাটে শুয়ে শুধু শান্তি অনুভব করেছিলুম।

রাত তিনটেয়, বোধহয়, একবার ধড়মড় করে জেগে উঠে ফের শুয়ে পড়েছিলুম।

* * *

সকালে উঠে দেখি, জভেরী ব্যাঙ্কে চলে গিয়েছে।

তারপর দেখি, পূর্ব রাত্রির প্রসন্নতা মন থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

কী যেন এক অজানা অস্বস্তির ভাব সর্ব দেহমন অসাড় বিকল করে দিয়েছে।

ফোন বাজল। জভেরী চিৎকার করে কি বলছে।

'শোনো, কাল রাত তিনটেয় শমশাদ আত্মহত্যা করেছে। দুটো চিঠি রেখে গিয়েছে। একটা পুলিসকে, একটা তোমাকে। তোমার চিঠিটার নকল জোগাড় করেছি। লিখেছে, 'মাই ডিয়ার এম, তোমার কথাই ঠিক। আমি চললুম। দেখা যখন তাঁর সঙ্গে হবেই তখন আর দেরি করে লাভ কি? আমি জানি আত্মহত্যা পাপ। আমার সব পুণ্যের বদলে এটা মাফ হয়ে যাবে।'

এখন মনে পড়ছে সন্ধ্যার সময় জভেরী বাড়ি এসে আমার হাত থেকে ফোন নামিয়েছিল।

এ-জীবনে এই প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলুম। আর এই শেষ॥

১৯৫৯॥

ছুছুন্দর কা সির্‌পর চামেলি কা তেল

লিঙ্গোয়াফোন রেকর্ডের কথা অনেকেই শুনেছেন। এ-রেকর্ডগুলোর সাহায্যে দিশী-বিদেশী যে-কোনো ভাষা অতি চমৎকাররূপে শেখা যায়। রেকর্ডগুলোতে বড় বড় ভাষা এবং উচ্চারণবিদরা গোড়ার দিকে খুব সহজ ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন, ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে শেষের রেকর্ডগুলোতে এমনি বেগে বলেছেন যে, সেটা আয়ত্ত করতে পারলে আপনি সে ভাষায় নিজেকে ওকীবহাল বলে পরিচয় দিতে পারবেন। প্রথম একখানা রেকর্ড নিয়ে বার বার সেটা শুনতে হয়। তারপর প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে, সামনে পাঠ্যপুস্তকের দিকে চোখ রেখে উচ্চারণ করে যেতে হয়। পাঠ্যপুস্তকে আবার 'অনুশীলন'ও থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও করতে হয়। 'কী' দেওয়া আছে। তাই দিয়ে ভুলগুলো মেরামত করে নিতে হয়।

বুদ্ধি-সুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই। শুধু গাধার খাটুনি আর সহিষ্ণুতা বা নিষ্ঠা কিংবা বলতে পারেন 'লেগে থাকার' প্রয়োজন।

আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যক্তিগত সুদৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর বেশির ভাগ জিনিস শেখার জন্য আক্কেল-বুদ্ধির প্রয়োজন অতি সামান্য। আসলে প্রয়োজন গাধার খাটুনি। বাঙলায় বা অন্য যে-কোনো ভাষাতে শব্দ-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন কোথায়? 'পদ্ম' শব্দের প্রতিশব্দ 'কমল', 'সরোজ', 'পঙ্কজ' শিখতে হলে কাউকে মাইকেলের মতো মেধাবী হতে হয় না, প্রয়োজন হয় ঐ কর্মে রোজ লেগে থাকার। কারো মুখস্থ হয় একদিনে, কারো লাগে তিনদিন। তফাৎ ঐটুকু মাত্র। স্বয়ং মাইকেলই নাকি বলেছেন, জিনিয়াসের ৯৯% পার্সপিরেশন, অর্থাৎ মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, আর মাত্র এক পার্সেন্ট ইন্‌সপিরেশন, অর্থাৎ বিধিদত্ত প্রতিভা।

অবশ্য, শুধু মাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাইকেলের মতো কাব্য রচনা করা যায় না। তবু নিছক খাটুনির জোরে যে-কোনো ভাষার অন্তত এতখানি

আয়ত্ত করা যায় যে, দেশের ৯৯% লোক তাকে ঐ ভাষায় পণ্ডিত বলে মেনে নেয়।

এবং এই সোনার বাঙলার ৯৯% লোক খাটতে রাজী নয়। রেওয়াজ না ক'রেই সে গাওয়াইয়া হয়ে যায়, নিত্য নবীন নাচ 'কম্পোজ' করতে থাকে।

কিন্তু সে-কথা থাক। পরনিন্দা বা আপন নিন্দা—আমিও তো বাঙালী বটি—ক'রে আমি পুজোর বাজারে রসভঙ্গ করতে চাইনে। তাই মূল কথা আরম্ভ করি।

এই লিঙ্গোয়াফোন রেকর্ড পত্তনের প্রথম যুগে বার্নাড শ' চারটি বক্তৃতা দেন। সেগুলো কিনতে পাওয়া যায়। অতি সুস্পষ্ট উচ্চারণে সুমধুর ভাষণ। ব্যঙ্গ-কৌতুক, রস-সৃষ্টি, আর তথ্য-পরিবেশ তো আছেই।

কথা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন,

"...হয়ত তুমি চালাক ছেলে। আমাকে শুধালে, তা হলে কি আমি সব সময় একই ধরনে কথা বলি ?

"আমি সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে নিচ্ছি, আমি করিনে। কেউই করে না। এই তো এই মুহূর্তে আমি হাজার হাজার গ্রামোফোনওলাদের সামনে কথা বলছি, এদের অনেকেই আমার প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি কথা প্রাণপণ বোঝবার চেষ্টা করছে। বাড়িতে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যে রকম বেখেয়ালে কথা কই, এখন যদি তোমাদের সে রকমধারা কথা কইতে যাই, তা হলে এ রেকর্ডখানা কারো এক কড়ির কাজে লাগবে না, আর এখন তোমাদের সঙ্গে যে রকম সাবধানে কথা বলছি, সে রকম যদি স্ত্রীর সঙ্গে বাড়িতে বলি, তা হলে তিনি ভাববেন আমার বদ্ধ পাগল হতে আর বেশি বিলম্ব নেই।

"জনসাধারণের সামনে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয় ব'লে আমাকে সাবধান থাকতে হয় যে, বিরাট হলের হাজার হাজার লোকের শেষ সারির শ্রোতাও যেন আমার প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শুনতে পায়। কিন্তু বাড়িতে ব্রেকফাস্টের সময় আমার স্ত্রী আমার থেকে মাত্র দু'ফুট খানেক দূরে বসে আছেন। তাই বেখেয়ালে এমনভাবে কথা বলি যে, তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে প্রায়ই বলেন, 'ও রকম বিড়বিড় করো না; আর দেখো, কথা বলার সময় অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ো না। তুমি যে কি বলছো আমি তার কিছু শুনতে পাচ্ছিনে।' এবং তিনিও যে সব সময় সাবধানে কথা বলেন তা-ও নয়। আমাকেও মাঝে মাঝে বলতে

হয় 'কি বললে?'[১] আর তিনি সন্দেহ করেন যে, আমি ক্রমেই কালা হয়ে যাচ্ছি, অবশ্য তিনি সেটা আমাকে বলেন না। আমি সত্তর পেরিয়ে গিয়েছি—কথাটা হয়ত সত্যি।

"কিন্তু এ-বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, রাজরাণীর সঙ্গে কথা বলার মতো আমি যেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কই এবং তাঁরও বলা উচিত যেন তিনি রাজার সঙ্গে কথা বলছেন। তাই উচিত; কিন্তু আমরা তা করিনে।

"আমাদের আদব-কায়দা দু'রকমের—একটা পোশাকী, অন্যটা ঘরোয়া। কোনো অপরিচিতের বাড়িতে গিয়ে যদি দরজার ফাঁক দিয়ে ওদের কথাবার্তা শোনো—অবশ্য আমি আদপেই বলতে চাইনে যে এরকম অভদ্র আচরণ তোমার পক্ষে আদৌ সম্ভব—কিন্তু তবু, ভাষা শেখার অত্যধিক উৎসাহে তুমি যদি কয়েক মুহূর্তের তরে এ রকম অপকর্ম করে শোনো, বাইরের কেউ না থাকলে পরিবারের লোক আপোসে কি ধরনে কথা বলে, এবং পরে যদি ঘরে ঢুকে ওদের কথা শোনো, তাহলে তোমার সামনে ওদের কথা বলার ধরন দেখে রীতিমত অবাক হয়ে যাবে। এমন কি, আমাদের ঘরোয়া কায়দা-কেতা পোশাকী কায়দার মতো উত্তম হলেও—আসলে আরো ভালো হওয়া উচিত—তাদের মধ্যে সব সময়ই পার্থক্য থাকে এবং সে পার্থক্য অন্য সব কায়দা কেতার চেয়ে কথাবার্তাতেই বেশি।

"মনে কর ঘড়িটাতে দম দিতে ভুলে গিয়েছি; ওটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাউকে তা হলে জিজ্ঞেস করতে হয়, ক'টা বেজেছে? অপরিচিত কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলবো, 'ক'টা বেজেছে, বলতে পারেন?' সে তখন প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শুনতে পায়, কিন্তু যদি স্ত্রীকে ঐ কথাই শুধাই তবে তিনি সর্বসাকুল্যে শুনতে পান 'ক'টা বেচ্চে?' তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করলে ওরকম বললে চলবে না। তাই এখন তোমাদের সামনে কথা বলছি স্ত্রর সঙ্গে কথা বলার চেয়ে অনেক বেশি সাবধানে কিন্তু লক্ষ্মীটি, ওঁকে সেটি বলো না।"

* * *

শ' কথাগুলি বলেছেন প্রধানত উচ্চারণ সম্বন্ধে। কারণ, তিনি রেকর্ডের মারফতে বিদেশীকে ভালো ইংরিজি উচ্চারণ শেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই নীতি

(১) এখানে শ' ইচ্ছে করেই 'আই বেগ ইয়োর পাড্‌ন', কিংবা 'এক্সকিউজ মি' বলেননি। ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাড়িতে স্ত্রীকে আমরা পোশাকী আদবকায়দা দেখাই নে।

যে 'আমরা সর্বত্রই একই উচ্চারণে কথা বলিনে', ভাষা সম্বন্ধে আরো বেশি প্রযোজ্য। শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ ইত্যাদি আমরা সকলের সামনে একই ভাবে বাছাই করে প্রয়োগ করিনে।

শ্বশুর মশায়ের সামনে ঘাড় নিচু করে, হাত পা দিয়ে বায়ু সমুদ্র মন্থন করা কিছুক্ষণের মত স্থগিত রেখে বলি, 'আজ্ঞে, রামবাবু বললেন, ঐ ব্যাপার নিয়ে আমি যেন দুশ্চিন্তা না করি।'

পিতাকে বলি, 'রামবাবু বললে, যাও, ও-কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

রকের ইয়ারকে বলি, 'শ্লা রেমোটা কি বললে জানিস্? বললে, 'যা যা ছোঁড়া, মেলা ডেঁপোমি কত্তি হবে না, আপন চরকায় তেল দে গে যা।'

শ' সর্বোচ্চ উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। সেটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। তিনি যে তাঁর স্ত্রীকে সমঝে চলতেন, এমন কি ডরাতেনও, সে-কথা কারো অজানা নেই। আর ডরায় না কে? 'পঞ্চতন্ত্র' পড়ে দেখুন—বিষ্ণুশর্মার লেখাটা নয়, অন্য একজনের। লাইব্রেরি থেকে ধার করে নয়, কিনে। লোকটা অন্নাভাবে আছে।

তাই প্রশ্ন উঠবে, উপরের যে রিপোর্টটি পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করছে, সেটি যদি বউয়ের কাছে নিবেদন করি, তবে সেটা কি রূপ নেবে?

সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে, বউ কি শুনতে চান। তিনি যদি শুনতে চান, রামবাবু ঐ কাজের ভারটা আপন কাঁধে তুলে নিয়েছেন, আপনাকে তাই নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না, তাহলে তো আপনি নিস্পরোয়া হয়ে গিয়ে তেরিয়া মেরে চড়াকসে বলবেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, গিন্নী, যা কয়েছো। আমি যতই বলি, 'রামবাবু, আপনাকে কিচ্ছুটি চিন্তা করতে হবে না, আমি সব বোঝা কাঁধে নিচ্ছি', তিনি ততই আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, 'না, ভায়া, ও কাজ আমার—তোমাকে দেখতে হবে না।' কি আর করি? ওঁর হাতেই সব ছেড়ে দিয়ে এলুম।"

আর যদি গিন্নী উল্টোটা আশা করে থাকেন? অর্থাৎ আপনি যদি মিশনে ফেল মেরে এসে থাকেন? তাহলে? তাহলে 'ঈশ্বর রক্ষতু'।

গলা সাফ করে ইদিক-উদিক তাকিয়ে কাঁচুমাঁচু হয়ে বলবেন— "—

আবার বলছি তখন ঈশ্বর রক্ষতু। আমি আর কি বলবো। চল্লিশ বছর হল বিয়ে করেছি। এখনো সে ভাষা শিখতে পারিনি।

মূল কথায় ফিরে যাই।

এ তো হল কথাবার্তায়। সাহিত্যে এ জিনিসটি আরো প্রকট।

সেখানে কাকে উদ্দেশ করে লিখছেন সেটা তো আছেই, তার উপরে আছে বিষয়বস্তু।

কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন মহাভারতের অনুবাদ করেছেন তখন ব্যবহার করেছেন সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষা, কারণ বিষয়বস্তু এপিক, গুরুগম্ভীর। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তিনি ব্যবহার করেছেন 'রকের' ভাষা। কারণ সেখানে বিষয়বস্তু 'বেলেল্লাপনা', অতএব চটুল এবং সেই কারণেই 'মেঘনাদবধের' ভাষা এক, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ভাষা অন্য। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ভাষা এক, 'কমলাকান্তের' ভাষা অন্য।

এমন কি ধরুন, বিষয়বস্তুও এক, কিন্তু সেখানে পরিবেশ এবং পাত্র ভিন্ন বলে ভাষাও ভিন্ন হল। 'পারস্য ভ্রমণে' রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন ঐ দেশের অভিজাত সম্প্রদায়, গুণীজ্ঞানীদের সঙ্গে—তাই তার ভাষা এক, এবং 'মরুতীর্থ হিংলাজের' পাত্রপাত্রী অতি সাধারণ জন—এমন কি রিফ্‌র্যাফ্—তাই তার ভাষা অন্য; 'মরুতীর্থ' 'পারস্যের' চেয়ে ভালো না মন্দ সে-কথা উঠছে না। দুটোই রসসৃষ্টি, কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস।

অর্থাৎ বিষয়বস্তু—কন্‌টেন্ট্—তার শৈলী, এবং ভাষা—স্টাইল—নির্বাচন করে। সেখানে উল্টোপাল্টা করলে রসসৃষ্টি হয় না।

'বঙ্কিমের ভাষার অনুকরণ করবে'—ছেলেবেলা থেকেই সে উপদেশ শুনেছি এবং ধরে নিয়েছি সে ভাষা 'রাজসিংহ', 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা।

ঐ ভাষা দিয়ে পাড়ার কানাই-বলাইয়ের কাহিনী লিখতে গেলে ফর্ম ও কন্টেন্টের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তার ফলে বারে বারে তাল কাটে। শরৎ চাটুজ্যের প্রথম যৌবনের লেখাতে তার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। প্রৌঢ় বয়সে তিনি তাঁর আপন ভাষা পেয়ে বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাল রেখে অদ্ভুত তবলা শোনালেন।

এমন কি 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা'র ভাষা দিয়ে 'কাচসংসদ' লেখা যায় না।

তাই রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমের অনুকরণ (ইমিটেশন) সহজেই হনুকরণ (এপিং) হয়ে যেতে পারে॥

আর্ট না অ্যাক্সিডেন্ট

আর্ট বলতে আমরা আজকাল মোটামুটি রস-ই বুঝি। তা সে কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে যে কোনো কলার মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক না কেন।

এখন প্রশ্ন আর্ট বা রসের সংজ্ঞা কি? সে জিনিস কি? তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে চিনব কি করে? অন্যান্য রস থেকে তাকে আলাদা করব কি করে? সরেস আর্ট কোনটা আর নিরেসই বা কোনটা?

প্রাচীন ভারত, গ্রীস এবং চীন—এই তিন দেশেই এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং অধুনা পৃথিবীর বিদগ্ধ দেশ মাত্রেই এ নিয়ে কলহ-বিসংবাদের অন্ত নেই। বিশেষ করে যবে থেকে 'মডার্ন আর্ট' নামক বস্তুটি এমন সব 'রস' পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে যার সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। এলোপাতাড়ি রঙের পোঁছকে বলা হল ছবি, অর্থহীন কতকগুলো দুর্বোধশব্দ একজোট করে বলা হল কবিতা, বেসুরো বেতালা কতকগুলো বিদঘুটে ধ্বনির অসমন্বয় করে বলা হল সঙ্গীত। বলছে যখন তখন হতেও পারে, কিন্তু না পেলাম রস, না বুঝলাম অর্থ, না দিয়ে গেল মনে অন্য কোনো রসের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত। তাই বোধহয় হালের এক আলঙ্কারিক মডার্ন ভাস্কর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, যখন ভাস্কর এক বিরাট কাঠের গুঁড়ি নিয়ে তার উপর ছমাস ধরে প্রাণপণ বাটালি চালানর পর সেটাকে কাঠের গুঁড়ির আকার দিতে পারেন, এবং নিচে লিখে দেন "কাঠের গুঁড়ি"—তখন সেটা 'মডার্ন ভাস্কর্য'।

ইতিমধ্যে এই মডার্ন আর্টের বাজারে একটি নূতন জীব ঢুকেছেন এবং সেখানে হুলস্থূল বাধিয়ে তুলেছেন—এর নাম অ্যাক্সিডেন্ট, বাঙলায় দুর্ঘটনা, দৈবযোগ, আকস্মিকতা যা খুশি বলতে পারেন।

এঁর আবির্ভাব হয়েছে সুইডেনের মতো ঠাণ্ডা দেশে—যেখানে মানুষ ঠাণ্ডাভাবে ধীরে-সুস্থে কথা কয়, চট করে যা-তা নিয়ে খামখা মেতে ওঠে না।

* * *

সুইডেনের মহাসম্মানিত ললিত-কলা আকাদেমির বিজ্ঞ বিজ্ঞ প্রফেসর, কলা-রসিক গুণীজ্ঞানীরা অকস্মাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কর্ণমূলের পশ্চাদ্দেশ কণ্ডুয়ন করতে লাগলেন। তাঁদের মহামান্যবর প্রেসিডেন্ট তো খুদাতাল্লার হাতে সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি বলেই ফেললেন, 'কি করি, মশাইরা, বলুন। কে জানত শেষটায় এ-রকম-ধারা হবে? আজকাল নিত্যি নিত্যি এত সব নয়া নয়া এক্স্‌পেরিমেণ্ট হচ্ছে যে, কোন্‌টা যে এক্স্‌পেরিমেণ্ট আর কোন্‌টা যে অ্যাক্‌সিডেণ্ট কি করে ঠাওবাই? আমরা ভেবেছি, চিত্রকর ফাল্‌স্ট্রোম্‌ আর্টের ক্ষেত্রে একটা অভিনব নবীন পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং তাই ভেবে ঐ ছবিটাও এক্‌জিবিশনের অন্যান্য ছবির পাশে টাঙিয়ে দিয়েছি'—

ওদিকে আর্টিস্ট ফাল্‌স্ট্রোম্‌ রেগে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সর্বত্র চেঁচামেচি করে বলতে লাগলেন, তাঁকে লোকচক্ষে হীন করার মানসে দুষ্ট লোক কুমতলব নিয়ে এই অপকর্মটি করেছে।

অপকর্মটি কি?

ফাল্‌স্ট্রোম্‌ ছবি আঁকার সময় একখানা ম্যাসোনাইটের টুকরোয় মাঝে মাঝে তুলি পুঁছে নিতেন। কাজেই সেটাতে হরেক রকম রঙ লেগে থাকার কথা। ঐ সময়ে সুইডিশ ললিত-কলা আকাদেমি এক বিরাট মহতী এক্‌জিবিশনের ব্যবস্থা করেন—'স্বতঃস্ফূর্ত কলা (স্পণ্টানিস্‌মুস বা Spontaneous art) ও তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ' এই নাম দিয়ে সে চিত্রপ্রদর্শনীতে সুইডেন তথা অন্যান্য দেশের স্পণ্টানিস্‌মুস কলার উত্তম উত্তম নিদর্শন তাতে থাকবে। (ক্যুবিজম, দাদইজমের মতো স্পণ্টানিয়েজম ও এক নবীন কলাসৃষ্টি পদ্ধতি—আমি অবশ্য এখানে সে প্রশ্ন তুলছিনে যে সার্থক কলাসৃষ্টি মাত্রই স্পনটেনিয়াস বা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে,—বিশেষ পদ্ধতিকে এ নাম দিলে তাকে চেনবার কি যে সুবিধে হয় বোঝা কঠিন।)

এখন হয়েছে কি, আর্টিস্ট ফাল্‌স্ট্রোম্‌ তাঁর অন্য ছবি যাতে করে ডাকে যাবার সময় জখম না হয় সেই উদ্দেশ্যে ঐ রঙবেরঙের ম্যাসোনাইটের টুকরোখানা তাঁর ছবির উপরে রেখে চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। আকাদেমির বড় কর্তারা ভাবলেন, এটাও মহৎ আর্টিস্টের এক নবীন মহান কলা-নিদর্শন, এবং পরম শ্রদ্ধাভরে সেই ম্যাসোনাইটের টুকরোটির নিচে আর্টিস্টের স্বনামধন্য নামটি লিখে ঝুলিয়ে দিলেন আর্টিস্টের অন্য ছবির পাশে!

ব্যাপারটা যখন ধরা পড়ল তখন আর্ট-সমালোচকরা কি যে করবেন ঠিক

করতে না পেরে চুপ করে গেলেন, আর সুইডেনবাসী আপনার আমার মতো সাধারণজন মুখ টিপে হাসলে যে বাঘাবাঘা পণ্ডিতেরা ঐ 'স্বতঃস্ফূর্ত' রসিকতাটা ধরতে না পেরে ফাঁদে পা ফেলেছেন বলে।

কিন্তু এইখানে ব্যাপারটার গোড়াপত্তন মাত্র।

সুইডেনের কাগজে কাগজে তখন আলোচনা আরম্ভ হল এই নিয়ে: একখানা উটকো কাঠ-জাতীয় জিনিসের উপর এলোপাতাড়ি রঙের ছোপকে যদি পণ্ডিতেরা আর্ট বলে মেনে নিতে পারেন, তবে তাঁদের ঢাক-ঢোল-পেটানো এই মহাসাধনার 'মডার্ন আর্টের' মূল্যটা কি?

ওইভিন্দ ফাল্স্ট্রোম্ সুইডেনের নাম-করা তরুণ চিত্রকর। তিনি সম্প্রতি এই 'স্বতঃস্ফূর্ত কলা-মার্গে' প্রবেশ করেছেন এবং কলা নির্মাণের ক্রমবিকাশে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর ঢং একাধিকবার আগাপাস্তলা বদ্লিয়েছেন। সুইডেনে এখন এই 'কনক্রীট', 'স্থূল', বা 'বাস্তব' মার্গের খুবই নামডাক; এঁরা নিজেদের অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত অনব্যবহিত ভাবে রঙের মারফতে প্রকাশ করেন—সে প্রকাশে কোনো বস্তু বা কোনো-কিছুর প্রতিকৃতি থাকে না, কোনো কিছু রূপায়িত করে না, ছবির নাম পর্যন্ত থাকে না—এবং দর্শক তাই দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সরাসরি আর্টিস্টের অনুভূতি বুঝে নিয়ে তার অর্থ করে নেয়,—কিংবা ঐ আশা করা হয়।

এই হল মোটামুটি তার অর্থ—অর্থাৎ অর্থহীন জিনিসকে যদি অর্থ দিয়ে বোঝাতে হয় তবে যে 'অর্থ' দাঁড়ায়।

ফাল্স্ট্রোম্ চিত্রপ্রদর্শনীতে দু'খানি ছবি পাঠাতে চেয়েছিলেন, এবং পূর্বেই বলেছি, সে দুখানি ছবি যাতে করে পোস্টাপিসের চোট না খায় তাই সঙ্গে সেই ম্যাসোনাইটের টুকরো দিয়ে সেগুলোকে প্যাক্ করে তিনি চলে যান গ্রামাঞ্চলে ছুটি কাটাতে। এদিকে আকাদেমির বাঘ-সিঙ্গিরা ছবি তিনখানা (আসলে অবশ্য দু'খানা) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বাছাই করে নিলেন দু'খানা,—এবং তার মধ্যে মনোনীত হয়ে গেল তুলি পোঁছার সেই ম্যাসোনাইটের পট্টি! ক্রিটিকদের কারোরই কাছে ঐ ম্যাসোনাইটের 'অঙ্কিত' তুলিপোঁছা রঙ-বেরঙ করা জিনিসটির স্টাইল বা বিষয়বস্তু অদ্ভুত বা মূল্যহীন ঠেকেনি। তার অর্থ, একদিকে চিত্রকরের 'ন্যায়তঃ' 'ধর্মসঙ্গত' আঁকা ছবি, ও অন্য-দিকে তাঁর তুলি পোঁছার এলোপাতাড়ি রঙের ছোপ—এ দু'য়ে কোনো পার্থক্য নেই।

তাই লেগেছে হুলস্থুল তর্কবিতর্ক, 'সে আর্ট তবে কী আর্ট যেখানে 'ভুল' জিনিস অক্লেশে খাঁটি আর্ট বলে পাচার হয়ে যায় ?'

এটা ধরা পড়ল কি করে ? ফাল্স্ট্র্যোম্ ছুটি থেকে ফিরে একদিন স্বয়ং গিয়েছেন চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে। সেখানে ঐ 'ম্যাসোনাইট ছবির' কাণ্ড দেখে যখন ভুলটা ধরা পড়ল তখন কোথায় না তিনি বিচক্ষণ জনের মতো চুপ করে থাকবেন—তিনি উল্টে আরম্ভ করলেন ভুলকালাম কাণ্ড !

ফলে, জ্ঞানবান পণ্ডিতমণ্ডলী, তীক্ষ্ণচক্ষু কলাসমালোচকের দল, ঝানু ঝানু আর্টসংগ্রহকারিগণ, সরলচিত্ত সাধারণ দর্শক এবং সর্বশেষে নিজেকে আর তামাম 'স্বতঃস্ফূর্ত-কলা-পন্থী'কে বিশ্বজনের সম্মুখে তিনি হাস্যাস্পদ করে ছাড়লেন !

এর কয়েক বছর পূর্বে এক বিদগ্ধ বিদূষক চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জীর 'আঁকা' একখানি 'ছবি' ঐ রকম এক চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়ে শহরের লোককে বোকা বানিয়েছিল—তখনও কেউ ধরতে পারেননি, ওটা বাঁদরের মস্করা।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ধরনের তামাশা চলবে কতদিন ধরে ? এই যে স্পণ্টানিস্টের দল, কিংবা অন্য যে কোনো নামই এদের হোক—এরা আর কতদিন ধরে আপন ব্যবহার দিয়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রকাশ করবেন যে এদের আর্ট কোনো-কিছু সৃজন করার দুরূহ শক্তিসাধনায় আয়ত্ত নয়, আকস্মিক দৈবদুর্বিপাক বা অ্যাক্সিডেণ্ট বা ঘটনাচক্র এঁদেরই মতো উত্তম উত্তম ছবি আঁকতে পারে, শ্রেষ্ঠ গান গাইতে পারে, সার্থক কবিতা রচনা করতে পারে—এতদিন যা শুধু সরস্বতীর বরপুত্রেরাই বহু সাধনার পর করতে পারতেন ?

এই প্রশ্নটি শুধিয়েছেন এক সরলচিত্ত, দিশেহারা সাধারণ লোক—সুইডেনের কাগজে।

উত্তরে আমরা বলি, কেন হবে না ? এক কোটি বাঁদরকে যদি এক কোটি পিয়ানোর পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়, এবং তারা যদি এক কোটি বংশপরম্পরা ওগুলোর উপর পিড়িং পাড়াং করে, তবে কি একদিন একবারের তরেও একটি মনোমোহিনী রাগিণী বাজানো হয়ে যাবে না ? সেও তো অ্যাক্সিডেণ্ট।

আমার ব্যক্তিগত কোনো টীকা বা টিপ্পনী নেই। মডার্ন কবিতা পড়ে আমি বুঝি না, আমি রস পাই না। সে নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। পৃথিবীতে এতশত ভালো জিনিস রয়েছে যার রসাস্বাদন আমি এখনো করে উঠতে পারিনি যে, আমার ওগুলো না হলেও চলবে ॥

১৯৫৯ ॥

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

আমরা যারা বাল্যবয়স থেকে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়েছি এবং আশ্রমবাসী সকলেই যাঁকে সেদিন পর্যন্ত এখানকার সর্বজনপূজ্য আচার্যশ্রেষ্ঠরূপে 'য়ে সঙ্কটের সর্বশ্রেষ্ঠ কাণ্ডারী ও আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী জেনে মনে মনে ীর পরিতৃপ্তি অনুভব করতাম, আজ আমাদের শোক সবচেয়ে বেশি।

ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে তাঁকে অসংখ্য লোক কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। হয়ত তাঁদের অনেকেই আমাদের চেয়ে তাঁকে পূর্ণতররূপে দেখেছেন, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের এবং সমগ্রভাবে আশ্রমের সত্তাতে যে আঘাত লেগেছে তার কঠোরতা আজ এই প্রথম আমরা বুঝতে আরম্ভ করলুম। এতদিন আমাদের এমন একজন ছিলেন যিনি বিশ্বভারতীর কর্ম থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তারপরও সেদিন পর্যন্ত তিনি আশ্রমবাসীদের সর্বাগ্রণীরূপে আমাদের মধ্যে ছিলেন। আশ্রমের দৈনন্দিন সমস্যাতে তাঁকে জড়িত করা হত না, কিন্তু তিনিই ছিলেন গুরুতর সমস্যাতে আমাদের সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক।

এখানকার শিক্ষাভবনের (অর্থাৎ ইস্কুলের) শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখানে তাঁর এই কর্মভার গ্রহণ যে উভয়ের পক্ষেই পরম শ্লাঘার বিষয়, সে-কথা দুজনেই জানতেন। পরবর্তী কালে উত্তর বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি অধ্যাপক হলেন ও সর্বশেষে বিশ্বভারতী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর তিনি উপাচার্যরূপে আশ্রম পরিচালনা করেন। 'উপাচার্য' শব্দ এখানে প্রয়োগ করাতে কেউ যেন ভুল না বোঝেন। এটি একটি রাষ্ট্রীয় অভিধা—বস্তুতঃ তিনি আচার্যোত্তম ছিলেন। আমি বলতে পারি, পৃথিবীর যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রধান আচার্যরূপে পেলে ধন্য হত।

এবং এই তাঁর একমাত্র কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়।

বস্তুত এরকম বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি সর্বদেশেই বিরল। কেউ তাঁকে জানেন সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিতরূপে, কেউ মধ্যযুগীয় সন্তদের প্রচারকরূপে, কেউ রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্যক্ রসজ্ঞ ও টীকাকাররূপে, কেউ চৈনিক-ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারার্থী গবেষকরূপে, কেউ বাউল-ফকীরের গূঢ় রহস্যাবৃত তত্ত্বজ্ঞানের উন্মোচকরূপে, কেউ শব্দতত্ত্বের অপার বারিধি অতিক্রমণরত সন্তরণকারীরূপে, কেউ সুখ-দুঃখের বৈদিকার্থে পুরোহিতরূপে, কেউ এই আশ্রমের অনুষ্ঠানাদিকে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী রূপ দিবার জন্য উপযুক্ত মন্ত্র আহরণে রত ঋষিরূপে—আমরা তাঁকে চিনেছি গুরুরূপে।

বিনয়বশতঃ প্রকৃত গুণীজন তাঁর গুণ আচ্ছাদিত রাখেন, কিন্তু শিষ্যের কাছে তাঁর সর্বগুণ উন্মোচন করে দেন। তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, অলঙ্কারশাস্ত্র তাঁর নখাগ্রদর্পণে ছিল এবং ভরতমম্মটসম্মত প্রাচীনতম আলঙ্কারিক সূত্র তিনি অতি সাধারণ, অতিশয় গ্রাম্য গীতিকাতে আরোপণ করে সে যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে সে-কথা বারবার সপ্রমাণ করতে জানতেন। বৈদ্যসন্তান বৈদ্যরাজও ছিলেন। রন্ধনশাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ ছিল। অভিনয়ে তিনি সুদক্ষ নট। ভারতের ঐক্যানুসন্ধানের পর্যটকরূপে চৈতন্য ও বিবেকানন্দের পরেই তাঁর নাম করতে হয়।

তাঁর আরো বহু গুণ ছিল। তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। আজ সেদিন নিশ্চয়ই নয়। এই এখন আমার কানে ভেসে আসছে ক্ষিতিমোহনের বিহারক্ষিতি শালবীথিকায় তাঁর স্মরণে শোকতপ্ত আশ্রমবাসিগণের সশ্রদ্ধ 'আগুনের পরশমণি' বৈতালিক গীত।

* * *

চিত্রে নন্দলাল। সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ। শাস্ত্রে বিধুশেখর। শব্দতত্ত্বে হরিচরণ। শিক্ষকতায় জগদানন্দ। রসে ক্ষিতিমোহন।

শুনেছি বিশ্বভারতী এঁদের সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশ করবেন। তার ভিতরই পাওয়া যাবে বিশ্বভারতীর নাতিসম্পূর্ণ ইতিহাস। এ কর্মে সংখ্যাতীত শিষ্যের সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি শুধু সেটুকু বলতে পারি যা স্বচক্ষে দেখেছি।

শাস্ত্র এবং রসালোচনায় রবীন্দ্রনাথের দুই বাহু ছিলেন বিধুশেখর এবং ক্ষিতিমোহন।

সকলেই আশা করেছিলেন, কাশীর শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সংস্কৃত চর্চায় যশস্বী হবেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে দিলেন বাঙলার জনবৈদগ্ধ্য

চর্চায়। আজ আর মধ্যযুগের সন্তরা যে পৃথিবীর সর্বসন্তদের সমকক্ষ একথা নিয়ে কেউ তর্কাতর্কি করে না, এ দেশের আউল-বাউলরা যে সাধনার গভীরতম অতলে পৌঁছে প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষিদেরই ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করেছিলেন সে কথাও কেউ অস্বীকার করে না, এমন কি কোন কোন অর্বাচীন ঐ বিষয়ে বিরাট গ্রন্থ লিখে এখন সপ্রমাণ করতে চায় যে, সে ক্ষিতিমোহনকেও ছাড়িয়ে গেছে, তাঁর 'অসম্পূর্ণ' জ্ঞান 'সম্পূর্ণতর' করে দিয়েছে! বিরাটকায় ক্ষিতিমোহনের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে বামনও হয়ত একটু বেশি দূর অবধি দেখতে পায় অস্বীকার করিনে, কিন্তু সে বামন ক্ষিতি অতিকায়ের বিরাট মস্তিষ্ক আর বিরাটতর হৃদয় পাবে কোথায়! তবে আজ এই বিতর্কমূলক প্রস্তাব (অবশ্য আমার কাছে নয়) উত্থাপন করব না—আজ শোকের দিন।

এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষিতিমোহন আউল-বাউল গান নিয়ে আলোচনা করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন সেটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রচর্চা পদ্ধতি। অর্থাৎ উপনিষদ বা গীতার টীকা লেখার সময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে রকম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠোদ্ধার করেন, অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, ঐ সব শাস্ত্রের মূল উৎসের অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতে তিনি আউল-বাউলের 'শাস্ত্র' অধ্যয়ন করে, টীকা লিখে তাদের জীবনদর্শন অধ্যাত্মদর্শন লোকচক্ষের সামনে তুলে ধরলেন।

এই কর্মে লিপ্ত হয়ে ক্ষিতিমোহন দেখতে পেলেন, আউল-বাউলের মূল উৎস যে শুধু বেদ উপনিষদ গীতা ভক্তিবাদে রয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে মুসলীম সূফীবাদ। তিনি তারই অনুসন্ধানে সূফীবাদের এমনই গভীরে পৌঁছলেন যে, বহু সুপণ্ডিত সূফী পর্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে, সূফী আবহাওয়ার এত দূরে থেকে এই লোকটি একে আপন প্রাণ-নিশ্বাসে ভরে নিল কি করে? রামমোহনকে যদি বলা হয় জবরদস্ত মৌলবী, এঁকে তাহলে বলতে হয় 'খবরদস্ত'—বা 'খবর্-দার-সূফী'। পূব বাঙলার অনাদৃত মুসলিম চাষীকে ক্ষিতিমোহন ছেলেবেলা থেকেই অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন—তিনি প্রমাণ করলেন তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা কুরান ও সূফীবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আশ্চর্য প্রাণশক্তিবলে সে তার চতুর্দিকের ভিন্ন সাধনাও আপন করে নিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, হিন্দু সাধকের কাছে সে ঋণীও বটে, উত্তমর্ণও বটে। এবং সর্বশেষে সপ্রমাণ করলেন, হিন্দু মুসলমান সাধনার মিলন হয়েছে এই 'চাষাভুষো'দের কল্যাণেই—মৌলভী ভশ্চাযে যে ভাবনা-সাধনার আদান-প্রদান অতি অল্পই হয়েছে সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

গণসাধনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দু ক্রিয়া-কর্মের দিকে আকৃষ্ট হলেন। 'মেয়েলী' বলে আমরা যে সব পালপার্বণ ব্রত-পূজা অবহেলা করে আসছিলুম সেগুলো একটি একটি করে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখাতে লাগলেন যে, এগুলোর ভিতরও অতি প্রাচীন ঐতিহ্য লুকোনো রয়েছে, এর অনেক-গুলোই চলে যায় আমাদের ধর্মানুসন্ধানের প্রাচীনতম যুগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করলেন যে, আমাদের অনেকগুলোই আবার আমাদের প্রতিবেশী 'অনার্য'দের কাছ থেকে নেওয়া।

সে এক বিপরীত দর্পণ! আমরা যে সব পালপার্বণকে ভেবেছিলুম অতিশয় খানদানী 'আর্য', ক্ষিতিমোহন প্রমাণ করলেন তার অনেকেই 'অনার্য' এবং তথাকথিত 'অনার্য' ক্রিয়াকর্মের মূল রয়েছে নৈকষ্য আর্যসাধনার গভীরে।

এর সব-কিছুই প্রেমী গবেষককে নিয়ে যায় ভারতবর্ষের ধর্মানুপ্রাণিত দর্শন-চর্চায়—কারণ একমাত্র দর্শনশাস্ত্রই বহুর বাহ্যরূপ উন্মোচন করে অন্তরের ঐক্য দর্শন করাতে পারে। সেখানে তিনি পেলেন জ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রনাথের[১] উপদেশ এবং সহযোগিতা—গুণী রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য যে তিনি অহরহ পেতেন সে জানা-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। এরই ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ড, যোগ ও তন্ত্রের রহস্যবাদ ও দর্শনের মূল তত্ত্বে রয়েছে একই নির্দ্বন্দ্ব সত্য।

(১) এই ঋষি সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে প্রায় কোনো আলোচনাই হয়নি। এ যুগে এঁর ভগবৎ-উপলব্ধি তুলনাহীন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদ্বিতীয় দার্শনিক ছিলেন। ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে এঁর যোগ হওয়াতে উভয়েই প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। নিম্নে ক্ষিতিমোহনকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের একখানি চিঠি ক্ষিতিমোহনের পুত্র শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে উদ্ধৃত করছি:

"হিরাক্লিটসের প্রকল্পিত অগ্নিব্রহ্মবাদের গোড়ার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আপনার বিচারে যাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন, এইটে আমি লিখতে ইচ্ছা করি।

প্রবর্তিত না বলিয়া প্রকল্পিত বলিলাম এই জন্য যেহেতু হিরাক্লিটসের মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারযোগ্য নহে—তাহা একটা তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মাত্র। "প্রকল্পিত" অপেক্ষা আরো বেশি সঙ্গতমাফিক বিশেষণ আমাকে দিতে পারেন তো ভালো হয়।

এই সত্যের ভানুমতী-দণ্ড হাতে নিয়ে ক্ষিতিমোহন প্রবেশ করলেন হীনযান, মহাযান এবং তারই ভিন্ন ভিন্ন তান্ত্রিক যান, নেপাল-তিব্বত-চীনের ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মজগতের ভিতর। সেই এক সত্য কখনো বৌদ্ধদর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাধারায়, তন্ত্রের বিকৃত কর্মকাণ্ডের পিছনেও সেই সত্য ভস্মাচ্ছাদিত, সেই সত্যই চর্যাপদে, সেই সত্যই পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতে, পশ্চিমবঙ্গের আউল-বাউলের গানে কখনো স্বপ্রকাশ, কখনো শাস্ত্রানধিকারীর উৎপাতে লুক্কায়িত—কখনো সরলতম ভাষায় স্বচ্ছ, কখনো রহস্যাবৃত রূপকে অাস্বচ্ছ কুহেলিকাঘন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এতে আর এমন নূতন কথা কি? আমরা তো চিরকালই স্বীকার করে এসেছি, সর্বধর্মেই সত্য সমাহিত।

সত্যই কি আমরা তা জীবনে স্বীকার করেছি? ধর্মের বাহ্যরূপে যে বিকট বিকট প্রভেদ অহরহ দেখতে পাচ্ছি, সে কি যুগ যুগ ধরে আমাদের ভিতর দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি করেনি? না হলে চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণের কি প্রয়োজন ছিল?

দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহন এঁদের মতো ধর্মসংস্কারক ছিলেন না। এঁদের প্রধান কর্ম ছিল যুগ যুগ সঞ্চিত আমাদের ঐতিহ্যের ধন যার প্রায় সব-কিছুই আমরা দৈনন্দিন জড় অভ্যাসের ফলে সম্পূর্ণ অবহেলা করে বসে আছি, সাধনাবিহীন মন্ত্রতন্ত্রই সর্বপাপহর বলে বিশ্বাস করে বসে আছি, মুখে 'সর্বভূতে নারায়ণ' কর্মে সে 'নারায়ণ'কে ডোম-চণ্ডালের কলুষতার ভয়ে সমাজ থেকে দূরে ঠেলে রেখেছি, স্বর্গে-পর্গে, ধর্মে-অধর্মে প্রভেদ করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি—এই নিদারুণ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি সেই সত্যের দিকে আকৃষ্ট করা যে-সত্য আমাদের হাতের কাছেই আছে,—লালন ফকীরের ভাষায়—

> "হাতের কাছে—পাইনে খবর
> খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর—!"

যাকে চাইলেই পাওয়া যায়।

ক্ষিতিমোহনের প্রধান কর্ম ছিল, সমাজের তথাকথিত নিম্নতম সম্প্রদায়েও যে-

---

"অগ্নিব্রহ্ম-বাদ" হয় কি না? এরূপ একটি কথা চলিতে পারে কি না—তাহাতে কি বুঝায়?

"প্রকল্পিত ইহার পরিবর্তে মনোভিমত, প্রস্তাবিত, উপন্যস্ত—এ তিনটির কোনোটি খাটে না। যেহেতু তাহা শুধু মনোভিমত বা প্রস্তাবিত বা উপন্যস্ত নহে। কাশীর পণ্ডিতেরা এরূপ স্থলে কিরূপ তান্ত্রিক ভাষা ব্যবহার করেন?

এই বিষয়ের উচিতানুচিত আমাকে লিখিয়া পাঠান।"

সত্য যুগপৎ লুক্কায়িত ও উদ্ভাসিত আছে তারই দিকে তথাকথিত শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মধ্যযুগের সন্তদের নিয়ে তিনি তাঁর সাধনা আরম্ভ করে নিচের দিকে নেমে এলেন আউল-বাউলে এবং সেখানে যে সব মণিমুক্তা পেলেন, তাদের প্রাচীনত্বের সন্ধানে উপরের দিকে গেলেন বেদ উপনিষদে। এই অবিচ্ছিন্ন তিন লোকে তাঁর গমনাগমন গতিধারা ছিল অতিশয় স্বতঃস্ফূর্ত আয়াসহীন। এটা পণ্ডিতজন-দুর্লভ—ধর্মলোকে বিধিদত্ত স্পর্শকাতরতা না থাকলে এ জিনিস সম্ভবে না।

ক্ষিতিমোহন পথ প্রদর্শন করার পর আরো অনেকেই আউল-বাউল নিয়ে চর্চা করেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক্ষিতিমোহন একক।

তার কারণ ক্ষিতিমোহনের এমন একটি গুণ ছিল যা এ যুগে আর কারও ছিল না—আমার অভিজ্ঞতায় পৃথিবীর কুত্রাপি আমি এ গুণটি দ্বিতীয় জনে দেখিনি।

কঠিনতম জিনিস সরল ভাষায় মধুর রূপে প্রকাশ করার অলৌকিক 'খুদা-দাদ' বিধিদত্ত ইন্দ্রজাল-শক্তি।

ক্ষিতিমোহন লিখেছেন যতখানি, বলেছেন তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কারণ তিনি জানতেন পুস্তক সর্বগামী নয়, লিখিত অক্ষরের শক্তি সীমাবদ্ধ।

বিদ্যালয়ের অজাতশ্মশ্রু বালক থেকে আরম্ভ করে শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, অভ্যাগত-রবাহুত সকলকে, সভাস্থলে, বন্ধুসমাগমে, রেলে-জাহাজে, হিমালয়ের চট্টিতে, নর্মদার পারে পারে, দেশে বিদেশে তিনি যেখানেই থেকেছেন, যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি এই অভূতপূর্ব বাচনভঙ্গি দ্বারা তাঁর বক্তব্য নিবেদন করে সকলকেই মুগ্ধ করেছেন। শত শত লেখক হাজার হাজার গম্ভীর পুস্তক লিখেও যা করতে সক্ষম হবেন না, কথকসম্রাট ক্ষিতিমোহন একাই তা করে গেছেন তাঁর খুদা দাদ এই সওগাতের দৌলতে।

সবিনয় নিবেদন করছি, আচার্য ক্ষিতিমোহনের বহুমুখী কর্ম এবং চিন্তাধারার সম্যক্ বিশ্লেষণ আমার সীমাবদ্ধ শক্তির বাইরে। যে-টুকু আছে তাও শোকাচ্ছন্ন। তবু আশ্রমবাসী, তাঁর শিষ্যরূপে তাঁরই স্মরণে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী পাঠক ও শ্রোতাদের উদ্দেশে এই কথা কয়টি নিবেদন করি।

আমার অক্ষমতম রচনাও তাঁর স্নেহাশীর্বাদ লাভ করত। পুণ্যলোক থেকে আগত তাঁর সে আশীর্বাদ থেকে আমার এ দীন শ্রদ্ধাঞ্জলি অকিঞ্চন গুরুদক্ষিণা বঞ্চিত হবে না—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস॥

১৯৬০॥